শংসিত বীজ ঃ কৃষি (ে ত্রে বীজ একটি গু(ত্বপূর্ণ উপকরণ। বর্তমানে জেলার কৃষকেরা শংসিত বীজ বা উন্নতমানের বীজের ব্যবহার সম্পর্কে খুবই সচেতন। কারণ উৎপাদনের প্রায় ১৮ - ২০ শতাংশ নির্ভর করে শংসিত বীজ / উন্নতমানের বীজের ব্যবহারের উপর। তাই ধান, গম, পাট, তৈলবীজ ইত্যাদি ফসলের শংসিত / উন্নতমানের বীজের চাহিদা উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। যদিও চাহিদার তুলনায় যোগান প্রায় সীমিত। স্বভাবতই চাষের সম্পূর্ণ বীজের চাহিদা মেটানো হয় কৃষকদের নিজস্ব উৎপাদিত বীজ / আদান-প্রদানের দ্বারা উন্নতমানের বীজ এবং সর্বোপরি বিভিন্ন বীজ সরবরাহকারী সংস্থার মাধ্যমে শংসিত বীজ / উন্নতমানের বীজ দ্বারা।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, ষাট দশক, সত্তর দশক এমনকি আশির দশকের প্রথম দিকেও সরকারী খামারে শুধু উন্নতমানের বীজ উৎপাদন করা হত। পরী(াগারে সেই উৎপাদিত বীজের ন্যুনতম মান নির্ণয় করার পর কৃষকদের সরকার নির্ধারিত মূল্যে বিতরণ করা হ'ত। ১৯৮৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যবীজ শংসিতকরণ সংস্থা স্থাপিত হয়। এর মুখ্য উদ্দেশ্য হ'ল শংসিত বীজ উৎপাদন করে তা কৃষকদের যোগান দেওয়া। ১৯৮৩ সাল থেকে এই পরিকল্পনা বাস্তবে কার্যকরী করার জন্য সরকারী খামারে শংসিত বীজ উৎপাদন শু(হয় এবং ধীরে ধীরে এর প্রসার ঘটে। এ ছাড়াও সরকারী সংস্থা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বীজ নিগম বহরমপুরে শংসিত বীজ উৎপাদনে সামিল হয়েছে এবং যৌথ উদ্যোগে শংসিত বীজের উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ছে।

খাদ্যঘাটতির মোকাবিলায় আর একটি দিগন্তকারী কৃষি প্রযুক্তি(হচ্ছে 'সঙ্কর বীজ' এর ব্যবহার। বিগত কয়েক বৎসর থেকে ধানের সঙ্কর বীজ উৎপাদন শু(হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, ধান ও সব্জীতে সঙ্কর বীজের ব্যবহারে উৎপাদনের হার বেড়েছে এবং কৃষকদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছে।

বিগত কয়েক বছরে জেলায় বিভিন্ন শস্যের শংসিত বীজ উৎপাদনের খতিয়ান সারণী- ৬.১১ তে তুলে ধরা হ'ল।

মাটি

এই জেলার মাটি বহুফসল চাষের প(ে অনুকূল। পশ্চিমবঙ্গের কৃষি মানচিত্রে বহুফসল চাষের নিরিখে এই জেলা একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। ভাগীরথী নদী এই জেলার উত্তর থেকে দ(িণ দিকে প্রবাহিত হয়ে প্রকৃতপ(ে এই জেলার মাটিকে দুই ভাগে ভাগ করেছে এবং এদের গঠন ও প্রকৃতিও আলাদা। ভাগীরথী নদীর পশ্চিম দিকের এলাকাকে রাঢ় এবং পূর্বদিকের এলাকাকে বলা হয় বাগড়ী। রাঢ় এলাকার মাটি সাধারণতঃ এঁটেল ও এঁটেল দোঁয়াশ, তুলনামূলক ভারী, ধূসর বা লালচে ধরণের দেখতে। জমি উঁচু ও সামান্য অসমতল এবং জমিগুলি পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে ঢালু। এই এলাকার মাটিতে সাধারণভাবে জৈব কার্বনে ঘাটতি দেখা যায় এবং অম্লত্ব থেকে স্বাভাবিক পর্যন্ত মাটির মানসূচক পাওয়া যায়। মূলতঃ এই এলাকার প্রধান ফসল হচ্ছে- ধান ও আলু। কিন্তু এখন তৈলবীজ, বিভিন্ন মরশুমের সব্জী ইত্যাদিও ভালোভাবে উৎপাদন হচ্ছে। অপরদিকে বাগড়ী এলাকার মাটি পলিমাটি, দোঁয়াশ এবং বেলে-দোঁয়াশ। এখানেও জৈব-কার্বনের ঘাটতি দেখা যায়। এই এলাকার প্রধান চাষ হলো - ধান, পাট, গম তৈলবীজ, ডালশস্য, সব্জী, আখ ইত্যাদি। এছাড়াও যে সব বিভিন্ন ফসলের চাষ এখানে ভাল হয় তার মধ্যে আম, লিচু, কাঁঠাল, কলা, পেঁপে, পেয়ারা ইত্যাদি অন্যতম।

মাটি পরী(া ও সুষম সারের প্রয়োগ ঃ বর্তমানে কৃষির অগ্রগতি ও ফসল উৎপাদনের মূল চাবিকাঠি হচ্ছে মাটি পরী(া এবং তার সুপারিশ অনুযায়ী সুষম সারের প্রয়োগ। এই মাটি পরী(া দ্বারা মাটির উর্বরতার সঠিম মান জেনে একদিকে যেমন সঠিক মাত্রায় সুষম সারের প্রয়োগ করে সারের অপচয় রোধ তথা আর্থিক ব্যয় সংকোচন করা সম্ভব হয়েছে। তেমনি অপরদিকে ঠিকমত ফলনও পেতে অসুবিধা হচ্ছে না। এ প্রসঙ্গে একটি কথা বলা যায় যে, আশির দশকের আগে এই জেলাতে মাটি পরী(ার কোন ব্যবস্থা ছিল না। আমাদের এই জেলার মাটির নমুনা সংগ্রহ করে জেলার বাইরের পরী(াগার থেকে মাটি পরী(া করা হ'ত। বহরমপুরে ১৯৮২ সালে একটি মাটি পরী(াগার স্থাপিত হয়। বর্তমানে মাটি পরী(ার জন্য কৃষকদের মধ্যে সচেতনতা জেগেছে। এখন মাটি পরী(া চাষের প্রধান অঙ্গ হিসাবে কৃষকেরা গ্রহণ করেছেন।

নীচের সারণীতে গত ৫ বৎসরের মাটি পরী(ার পরিসংখ্যান দেওয়া হ'ল। মাটি পরী(ার চাহিদা যে উত্তরোত্তর বাড়ছে, তা পরিসংখ্যান থেকেই প্রতিফলিত হয় সারণী-৬.১২ তে।

সারণী - ৬.১২

বহরমপুর মাটি পরী(াগারে

বাৎসরিক মাটি পরী(ার তুলনামূলক চিত্র

বৎসর	নমুনা সংখ্যা
১৯৯৫-৯৬	৪,৭৭০
১৯৯৬-৯৭	৫,৩৮৫
১৯৯৭-৯৮	৫,৬৫৫
১৯৯৮-৯৯	৫,৩১৮
১৯৯৯-২০০০	৬,৩৪৬

সূত্রঃ মুখ্য কৃষি আধিকারিক, মুর্শিদাবাদ

সারণী - ৬.১১
শংসিত বীজ উৎপাদনের খাতিয়ান (১৯৮৯ - ২০০০)

বছর	সংস্থার নাম	ধান	গম	তৈলবীজ	ডালশস্য	পাট	অন্যান্য	মোট
	সরকারী খামার	৯২৩.৬৭	৩২৫.২৯	১১.৯৩	৪৬.৮৩	৫৫.৪৭	-	১৩৬৩.১৯
১৯৮৯ - ৯০	পঃ বঃ রাজ্যবীজ নিগম	১০১৫.২৮	১৫৫.২	-	২.২৫	-	-	১১৭২.৭৩
	সি.এ.ডি.সি	-	৩২.৪৭	৩.৪৫	-	-	-	৩৫.৯০
	(বহরমপুর প্রকল্প)							
	সরকারী খামার	১২৩৫.৪৮	১১৯.০৩	৮৮.০২	৮৭.৫	২৯.৪৬	-	১৫৫৯.৪৯
১৯৯০ - ৯১	পঃ বঃ রাজ্যবীজ নিগম	১৫৯.৯৩	৯৭.৮	৪২.৩৩	২.২৫	-	-	৩০৮.২৫
	সি.এ.ডি.সি	৯৮৪.৮৩	৩৯.০	২.২৩	১.০০	০.৫৫	৫৯৪.৬	১৬২২.২১
	(বহরমপুর প্রকল্প)							
১৯৯৫ - ৯৬	সরকারী খামার	৮১৯.০৬	৩২১.৯৮	৭০.৩৪	৪৯.৭৯	৭.২৩	-	১২৬৮.৪
	পঃ বঃ রাজ্যবীজ নিগম	৪৯৭.৮০	৬৮৭	১১১.১৯	২.৮৯	-	-	৬৮০.১৫
	সি.এ.ডি.সি	-	-	-	-	-	-	-
	(বহরমপুর প্রকল্প)							
	সরকারী খামার	৯২৩.৬৭	৩২৫.২৯	১১.৯৩	৪৬.৮৩	৫৫.৪৭	-	১৩৬৩.১৯
১৯৯৬ - ৯৭	পঃ বঃ রাজ্যবীজ নিগম	১০১৫.২৮	১৫৫.২	-	২.২৫	-	-	১১৭২.৭৩
	সি.এ.ডি.সি	-	৩২.৪৭	৩.৪৫	-	-	-	৩৫.৯০
	(বহরমপুর প্রকল্প)							
	সরকারী খামার	১২৩৫.৪৮	১১৯.০৩	৮৮.০২	৮৭.৫	২৯.৪৬	-	১৫৫৯.৪৯
১৯৯৭ - ৯৮	পঃ বঃ রাজ্যবীজ নিগম	১৫৯.৯৩	৯৭.৮	৪২.৩৩	২.২৫	-	-	৩০৮.২৫
	সি.এ.ডি.সি.	৯৮৪.৮৩	৩৯.০	২.২৩	১.০০	০.৫৫	৫৯৪.৬	১৬২২.২১
	(বহরমপুর প্রকল্প)							
	সরকারী খামার	৮১৯.০৬	৩২১.৯৮	৭০.৩৪	৪৯.৭৯	৭.২৩	-	১২৬৮.৪
১৯৯৮ - ৯৯	পঃ বঃ রাজ্যবীজ নিগম	৪৯৭.৮০	৬৮.২৭	১১১.১৯	২.৮৯	-	-	৬৮০.১৫
	সি.এ.ডি.সি	-	-	-	-	-	-	-
	(বহরমপুর প্রকল্প)							
	সরকারী খামার	১০৮৫.৭৪	১৪৯.৮১	৪২.৬০	৭.৯৮	১০.২৪	-	১২৮৬.৪১
১৯৯৯ - ০০	পঃ বঃ রাজ্যবীজ নিগম	১৫৪৯.৯৩	-	১৩৩.৫০	৪.৪৫	-	-	১৬৮৭.৮৮
	সি.এ.ডি.সি	৩৬১.১১	১০২.১১	-	-	-	-	৪৬৮.০৭
	(বহরমপুর প্রকল্প)							

সূত্রঃ মুখ্য কৃষি আধিকারিক, মুর্শিদাবাদ

এই সুযোগ পাওয়ার জন্য জেলার কৃষকেরা গর্বিত। কারণ পশ্চিমবঙ্গে মোট ৩টি পরী(াগারে অণুখাদ্য পরী(ার ব্যবস্থা আছে, তার মধ্যে বহরমপুর অন্যতম। অণুখাদ্য ব্যবহার করে সব্জী উৎপাদনে এবং তণ্ডুলজাতীয় ফসলেও সুফল পাওয়া যাচ্ছে।

সারণী- ৬.১৩ তে গত ৫ বৎসরের অণুখাদ্য পরী(ার পরিসংখ্যান দেওয়া হল। এই পরী(ার চাহিদা ত্র(মশ বাড়ছে। বর্তমানে অণুখাদ্যের ব্যবহার সম্বন্ধে কৃষকগণ খুবই সচেতন। অণুখাদ্য ব্যবহার করে বিশেষ করে সব্জি উৎপাদনে এমনকি তণ্ডুলজাতীয় ফসলেও এর সুফল পাওয়া যাচ্ছে।

নীচের সারণীতে গত ৫ বৎসরের অণুখাদ্য পরী(ার পরিসংখ্যান দেওয়া হ'ল। এই পরী(ার চাহিদা ত্র(মশ বাড়ছে।

সারণী - ৬.১৩

অনুখাদ্যের জন্য মাটি পরী(ার তুলনামূলক চিত্র

সাল	নমুনা সংখ্যা
১৯৯৫-৯৬	৪৭৮
১৯৯৬-৯৭	৬৮২
১৯৯৭-৯৮	৮৮৫
১৯৯৮-৯৯	১,১৬২
১৯৯৯-০০	৯৩৪

সূত্রঃ মুখ্য কৃষি আধিকারিক, মুর্শিদাবাদ

সার ও সুষম সারের প্রয়োগ ঃ ফসল উৎপাদনের ে(ত্রে সার হচ্ছে সবচেয়ে গু(ত্বপূর্ণ উপকরণ। উৎপাদনশীলতার প্রায় ৪০ শতাংশ নির্ভর করে সুষম সারের ব্যবহারের উপর। এটি একটি ব্যয়সাপে(উপকরণ। তাই কৃষকরা চেষ্টা করে মাটি পরী(ার উপর ভিত্তি ক'রে সুষমহারে সারের প্রয়োগে উৎপাদনের ধারাকে বজায় রাখতে।

জেলাতে সেচ সেবিত এলাকার সম্প্রসারণ হচ্ছে। পাশাপাশি বিভিন্ন ফসলের উচ্চফলনশীল জাতির এলাকাও সমহারে বাড়ছে। তাই স্বাভাবিকভাবে রাসায়নিক সারের ব্যবহারও সেই অনুপাতে বাড়ছে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত থাকছে।

সারণী- ৬.১৪ তে ১৯৮০ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশ সারের ব্যবহার দেখান হয়েছে।

ঐ সারণী থেকে বোঝা যায় যে, বিগত ২০ বৎসরে নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশ সারের ব্যবহার যথাত্র(মে ৩.৪ গুণ ৩.২৭ গুণ এবং ২.১৮ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ১৯৮০ সালের আগে ফসফেট ও পটাশ সারের ব্যবহারের চেয়ে নাইট্রোজেন সারের ব্যবহারের মাত্রা বেশী ছিল এবং তখন চাষের নিবিড়তা কম ছিল।

তারপর ৮০ দশকে এবং বিশেষ করে ৯০ দশকে সুষম হারে এবং আনুপাতিক হারে রাসায়নিক সার ব্যবহার করে জমির উর্বরতা এবং ফসলের উৎপাদন বজায় রাখা যায় তার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। সাধারণতঃ যে কোন ফসলে নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশ সারের ব্যবহারের আনুপাতিক হার ২ ঃ ১ ঃ ১।

বিভিন্ন কারণের জন্য এই জেলাতে সারের ব্যবহার কাম্য আনুপাতিক হারে পৌঁছান সম্ভব হয়নি, তবু আশা করা যায় আগামী দিকে কৃষকদের সচেতনতায় এবং পটাশ ও ফসফেট সারের যোগান অব্যাহত থাকলে তা সম্ভব হবে।

মাটির স্বাস্থ্য- সবুজ সার ও জীবানু সারের প্রয়োগ ঃ চাষের নিবিড়তা ত্র(মশই বাড়ছে। খাদ্য উৎপাদনের ল(্যমাত্রা ঠিক রাখার জন্য তাই প্রয়োজন মাটির স্বাস্থ্যকে অটুট রাখা। সেইদিক থেকে সবুজ সার এবং প্রয়োজনমত জৈব সারের প্রয়োগ দরকার। জেলার কৃষকরা ও বিষয়ে এগিয়ে এসেছে। জেলার (ুদ্র ও প্রান্তিক চাষীভাইদের উৎসাহিত করার জন্য ১৯৯২-৯৩ সাল থেকে বিনামূল্যে ৪ কেজি হারে ধৈঞ্চার মিনিকট বিতরণ করা হয়েছে , যা সবুজ সার হিসাবে ব্যবহার করা যায়। সারণী-৬.১৫ তে বিগত কয়েক বছরের সবুজ সার হিসাবে ধৈঞ্চা মিনিকিট বিতরণের

সারণী - ৬.১৪

জেলায় নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশ সারের ব্যবহার (মেট্রিক টন)

	১৯৮০-৮১	১৯৮৫-৮৬	১৯৯০-৯১	১৯৯৫-৯৬	১৯৯৯-২০০০
নাইট্রোজেন	১৪০০০	২০০৪০	৩০৯০০	৩২৫৫৯	৪৮০০০
ফসফেট	৫৫০০	৭৭৪৬	১২৭৫০	১৩৮৭৭	১৮০০০
পটাশ	৪৫০৩	৫৭৬০	১০৪৯৩	১০২৯৯	১১৮০০

সূত্রঃ মুখ্য কৃষি আধিকারিক, মুর্শিদাবাদ

খতিয়ান দেওয়া হ'ল।

এছাড়া মাটির স্বাস্থ্য ও নাইট্রোজেন সারের খরচ কমানোর জন্য ধান (্ তে জীবাণু সার ও সবুজ শ্যাওলার ব্যবহার শু(হয়েছে। প্রশি(ণের মাধ্যমে কৃষকদের মধ্যে এ বিষয়ে সচেতনতা আনা হয়েছে।

সারণী - ৬.১৫

ধৈঞ্চা মিনিকিট বিতরণের তুলনামূলক চিত্র

বৎসর	মিনিকিট সংখ্যা
১৯৯২-৯৩	১৫,০০০
১৯৯৩-৯৪	১০,০০০
১৯৯৫-৯৬	৩,৫০০
১৯৯৬-৯৭	৩,৫০০
১৯৯৭-৯৮	৬,০০০

সূত্রঃ মুখ্য কৃষি আধিকারিক, মুর্শিদাবাদ

রাসায়নিক সারের মান নিয়ন্ত্রণ ঃ জেলাতে ১৯৮২ সালে সারের মান নিয়ন্ত্রণ পরী(াগার স্থাপিত হয়। জেলার বিভিন্ন সার বিপণন কেন্দ্র থেকে সারের নমুনা সংগ্রহ করে পরী(াগারে সারের মান নিয়ন্ত্রণ করা হয়। পরী(াগারে নিম্নমানের সার দেখা গেলে সং(-ষ্ট সংস্থার বি(দ্ধে আইনানুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয় যাতে কৃষকগণ (তিগ্রস্ত না হন তথা কৃষি উৎপাদন ব্যাহত না হয়।

বিগত ৫ বৎসরের সার-নমুনা পরী(া সংত্র(ান্ত পরিসংখ্যান দেওয়া হ'ল সারণী- ৬.১৬ তে।

সারণী - ৬.১৬

বহরমপুর পরী(াগারে সারের নমুনা সংগ্রহ ও মান নিয়ন্ত্রণ

বৎসর	সংখ্যা
১৯৯৫-৯৬	৭৭৯
১৯৯৬-৯৭	৯৪৩
১৯৯৭-৯৮	৬৩৯
১৯৯৮-৯৯	৭০০
১৯৯৯-২০০০	১,০২৯

সূত্রঃ মুখ্য কৃষি আধিকারিক, মুর্শিদাবাদ

কীটনাশক ঔষধের ব্যবহার এবং রোগ-পোকা সুসংহতভাবে নিয়ন্ত্রণ ঃ কৃষি(ত্রে শস্যর(ার জন্য কীটনাশক ঔষধের ব্যবহার দীর্ঘদিন থেকে চলে আসছে। বস্তুতপ(ষাট সত্তর দশকে কৃষি(ত্রে রোগ-পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য কীটনাশক ঔষধপত্র আগাম ব্যবহার করা হ'ত। এমনকি আশির দশকেও বেশীরভাব (্ ত্রে এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হ'ত। আশির দশক থেকেই ফসল পরিদর্শন এবং রোগ পোকা আত্র(মণ-প্রতিরোধে কীটনাশক ঔষধের ব্যবহার শু(হয়।

ষাট-সত্তর দশকে যেহেতু কীটনাশক ঔষধপত্রের ব্যবহার প্রয়োজনভিত্তিক ছিল না, তাই বেশীর ভাগ (্ ত্রেই এর যথেচ্ছ ব্যবহারে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। পরিবেশ দূষণও তার মধ্যে অন্যতম। কৃষিবিজ্ঞানের সৌজন্যে বিগত শতাব্দীর আশির দশকের শেষ এবং নব্বই দশকে কৃষি(ত্রে রোগ - পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য কীটনাশক ঔষধপত্রের প্রয়োগের আমূল পরিবর্তন হয়েছে। তার সুবাদে ১৯৯৫ - ৯৬ সালে এই জেলাতে ফসল পরিদর্শন সাপে(সুসংহত ভাবে রোগ- পোকা নিয়ন্ত্রণের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। এই কর্মসূচীর মুখ্য উদ্দেশ্য হ'ল একদিকে কীটনাশক ঔষধপত্রের যথেচ্ছ ব্যবহার বন্ধ করা এবং উৎপাদনের ল(্যমাত্রা ঠিক রাখতে প্রয়োজনভিত্তিক কীটনাশক ঔষধপত্রের ব্যবহার করে বন্ধু ও শত্রু পোকার ভারসাম্য বজায় রাখা। অপর দিকে পরিবেশকে যথাসম্ভব দূষণমুক্ত(রাখা।

জেলাতে এই প্রকল্পটি চালু হওয়ার পর থেকে ধান, তৈলবীজ ও ডালশস্যের উপর প্রায় ১৫০০০ জন কৃষককে হাতেকলমে এ বিষয়ে প্রশি(ণ দেওয়া হয়। এই প্রশি(ণের মাধ্যমে কৃষকেরা এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য, বন্ধু ও শত্রুপোকার সনাক্ত(করণ এবং প্রয়োজনে কীটনাশকের ব্যবহার সম্বন্ধে সচেতন হয়েছেন।

সারণী- ৬.১৭ তে বিগত ৫ বছরের কীটনাশক ঔষধপত্রের ব্যবহার দেখান হ'ল -

সারণী- ৬.১৭

জেলায় কীটনাশক ব্যবহারের তুলনামুলক চিত্র

বৎসর	তরল (কি.লি.)	দানাদার (মে.টন.)	গুড়ো (মে.টন.)
১৯৯৪-৯৫	৭০	১০১.৫	৩৫৫.০০
১৯৯৫-৯৬	৬৫.৪	৯৫.৮	২১০.০০
১৯৯৬-৯৭	৫৪.৫	৮৫.৬	১৯০.৭০
১৯৯৭-৯৮	৪৯.৪	৭০.২	১৫০.০০
১৯৯৮-৯৯	৪৫.৪	৬০.২	১৪০.০০
১৯৯৯-২০০০	৪১.২	৫৫.৫	১৩৫.০০

সূত্র ঃ মুখ্য কৃষি আধিকারিক, মুর্শিদাবাদ

এছাড়াও শস্য র(ার প্রযুক্তি(তে কৃষিবিজ্ঞান আরও এক ধাপ এগিয়ে আসায় সম্প্রতি জেলাতে নিম থেকে তৈরী এবং জীবাণু কীটনাশক ঔষধপত্রের ব্যবহার শু(করা হয়েছে। এর ব্যবহার ফসল উৎপাদন ছাড়াও পরিবেশকে যথাসম্ভব দূষণমুক্ত(

রাখা এবং কীটনাশক ঔষধপত্রের বিষত্রি(য়া থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য বিশেষ সহায়ক । প্রাথমিকভাবে কৃষকদের ৫০% ভর্তুকীতে এই নতুন কীটনাশক ঔষধগুলি বিলির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এছাড়াও কীটনাশক ঔষধপত্রের মান যাতে ঠিক থাকে সেজন্য জেলার বিভিন্ন প্রান্তের কীটনাশক বিপণন কেন্দ্র থেকে ঔষধের নমুনা সংগ্রহ করে পরী(াগারে মান নির্ণয় করার জন্য পাঠান হয়। প্রয়োজনে সংলিষ্ট বিত্রে(তা / প্রতিষ্ঠানের বি(দ্ধে আইনানুযীয় সরকারী ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

সম্প্রতি কৃষকদের সুবিধার্থে জেলার শস্যর(ার ইউনিটকে আরো মজবুত করা হয়েছে, যার সুবাদে জেলাতে ২টি রোগ-পোকা নির্ধারণ পরী(াগার স্থাপন করা হয়েছে। এর মধ্যে একটি কান্দী এবং অপরটি বহরমপুরে। এর মাধ্যমে কৃষকরা ফসলের রোগ-পোকার আত্র(মণ এবং তার নিয়ন্ত্রণে যথাযথ সুপারিশ তৎ(ণাৎ পেয়ে যাবে।

আধুনিক ও উন্নত কৃষি যন্ত্রপাতি

আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির মধ্যে বীজ বপন যন্ত্র, ফসল নিড়ানী যন্ত্র এবং লোহার লাঙলের ব্যবহার বিগত শতাব্দীর ষাটের দশক থেকে চলে আসছে। সত্তর, আশি দশক থেকে পাওয়ার টিলার এবং ট্রাকটারের ব্যবহার শু(হয়েছে। এছাড়াও কৃষি যন্ত্রপাতি হলো থ্রেসার বা ধান ও গম ঝাড়াই যন্ত্র। এর প্রয়োজনীয়তাও দিন দিন বেড়ে চলছে।

জেলায় কৃষকদের কীটনাশক ঔষধ প্রয়োগের জন্য স্প্রেয়ার ডাস্টার ইত্যাদি সরকারী ভর্তুকীতে সরবরাহ করা হয়। সাধারণভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের পাট উন্নয়ন প্রকল্পাধীন বহরমপুর ও লালবাগ মহকুমার কৃষকদের বীজ বপন যন্ত্র, ফসল নিড়ানী যন্ত্র বিগত আশির দশক থেকে সরবরাহ করা হচ্ছে। জেলার সব ব্লকেই সরকারী ভর্তুকী এবং ব্যাঙ্ক ঋণের মাধ্যমে কৃষকদের ট্রাকটার সরবরাহ করা হচ্ছে এবং এর চাহিদা উত্তরোত্তর বাড়ছে।

রাজ্য সরকারের নিজস্ব খাত ছাড়াও জেলাতে কেন্দ্রীয় সরকারের ডাল উন্নয়ন প্রকল্প, ই(উন্নয়ন প্রকল্প, তৈলবীজ উন্নয়ন প্রকল্প চালু আছে সেখানে থেকে স্প্রেয়ার/ডাস্টার কৃষকদের মধ্যে সরবরাহ করা হয়।

নিবিড় তন্ডুল জাতীয় শস্য উন্নয়ন প্রকল্পাধীন জেলার ৫ টি ব্লকে যথা - ডোমকল , নওদা, মুর্শিদাবাদ-জিয়াগঞ্জ, লালবাগ এবং সাগরদীঘিতে আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি কৃষকদের ভরতুকিতে সরবরাহ করা হয়েছে। বিগত কয়েক বৎসরের পরিসংখ্যান সারণী- ৬.১৮ তে দেওয়া হ'ল-

এছাড়াও রাজ্য সরকারের নিজস্ব খাতে উন্নতমানের কৃষি যন্ত্রপাতি যথা ডাস্টার, স্প্রেয়ার,ধান ঝাড়াই যন্ত্র (থ্রেসার) ভর্তুকীতে কৃষকদের সরবরাহ করা হয়। বিগত কয়েক বৎসরের পরিসংখ্যান সারণী- ৬.১৯ এ দেওয়া হ'ল ঃ -

সারণী - ৬.১৮

নিবিড় তন্ডুল জাতীয় শস্য উন্নয়ন প্রকল্পে কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ

বৎসর	ধান ঝাড়াই যন্ত্রের (থ্রেসার) সংখ্যা	ব্যয় টাকা	পাওয়ার টিলারের সংখ্যা	ব্যয় টাকা
১৯৯৫-৯৬	১০৭৮	৬,৫৬	--	--
১৯৯৬-৯৭	৯০৪	৫,৪৯	--	--
১৯৯৭-৯৮	৩৫০	২,১৪	১২	৩,৬০
১৯৯৮-৯৯	৩৫০	১,৭৫	১২	৩,৬০
১৯৯৯-০০	৩২০	১,৬০	১২	৩,৬০

সূত্র ঃ মুখ্য কৃষি আধিকারিক, মুর্শিদাবাদ

সারণী - ৬.১৯

রাজ্য সরকার কতৃক কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ

বৎসর	থ্রেসাবের সংখ্যা	স্প্রেয়ারের সংখ্যা	স্প্রেয়ার/ ডাস্টার	ব্যয় ল(টাকা
১৯৯২-৯৩	৬১	-	-	০.৩৬
১৯৯৭-৯৮	-	৭১	-	০.৩০
১৯৯৮-৯৯	-	-	২০৯	০.৬৯
১৯৯৯-০০	-	২১২৭	-	১.১৩

সূত্র ঃ মুখ্য কৃষি আধিকারিক, মুর্শিদাবাদ

কৃষি ঋণ ঃ সাধারণতঃ কৃষিঋণ দুইভাবে দেওয়া হয়। একটি হচ্ছে ফসল-ঋণ এবং অপরটি মধ্য মেয়াদী কৃষি যন্ত্রপাতি, সেচ ইত্যাদি বিষয়ক ঋণ। কৃষকগণ কৃষিঋণ ছাড়াও এইসব ব্যাঙ্ক থেকে গবাদি পশু ত্র(য় ঋণ, মৎস্য চাষের ও পশুপালন ঋণ পেয়ে থাকেন। কৃষকগণ যাতে প্রয়োজনমত এবং সময়মত কৃষিঋণ পেতে পারেন তার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা আগাম করা হয়। কৃষকদের ঋণের দরখাস্ত স্থানীয় পঞ্চায়েত ও কৃষি বিভাগের কর্মীরা যৌথভাবে গ্রহণ করে। পঞ্চায়েত সমিতির সুপারিশ নিয়ে কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক তা বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কে ও সমবায় ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দেন। রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্ক ও সমবায় ব্যাঙ্ক এরপর তাদের করণীয় কাজ সেরে কৃষকদের ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করে। মুর্শিদাবাদ জেলার অগ্রণী ব্যাঙ্ক প্রবন্ধক মহাশয়ের তরফ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জেলার বিগত পাঁচ

6th 5t

সারণী- ৬.২০

ফসল ঋণ ও কৃষি যন্ত্রপাতি ঋণ *

বৎসর	সংস্থা	ফসল ঋণ		কৃষি যন্ত্রপাতি ঋণ	
		ল(্যমাত্রা	ঋণলগ্নী	ল(্যমাত্রা	ঋণলগ্নী
১৯৯৫-৯৬	রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক	১১০১.৯৫	১০২৫.০০		
	সমবায় ব্যাঙ্ক	১৪৬১.০৯	১৩৮৯.৫০		
	মোট	**২৫৬৩.০৪**	**২৪১৪.৬২**		
১৯৯৬-৯৭	রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক	১৩৩৬.৪০	১০৪৯.০২		
	সমবায় ব্যাঙ্ক	১৮০০.৯১	১২৭০.২৫		
	মোট	**৩১৩৭.৩১**	**২৩১৯.২৭**		
১৯৯৭-৯৮	রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক	৭৪১.৮১	৫৮৩.৩২	৬৯৯.১১	৪৯৫.৩৮
	সমবায় ব্যাঙ্ক	১৪৪১.৪১	৯৩৪.২৮	৭১৫.১৪	১০১৫.৫৭
	মোট	**২১৮৩.২২**	**১৫১৭.৭০**	**১৪১৪.২৫**	**১৫১০.৯৫**
১৯৯৮-৯৯	রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক	৭২১.৮৮	৭২৮.৭৩	৮৫৫.৯৭	৪৩৮.১০
	সমবায় ব্যাঙ্ক	২১২৮.৭৫	৬৯৮.৩২	৬৬৮.৫২	৪৩৭.৪৪
	মোট	**২৮৫০.৬৩**	**১৪২৭.০৫**	**১৫২৪.৪৯**	**৮৭৫.৫৪**
১৯৯৯-২০০০	রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক	৭১১.৯৮	৮৪২.৮৮	১০৫৪.৫৪	৪১৫.০৯
	সমবায় ব্যাঙ্ক	২১৫৬.২৫	৮৪১.৭৯	৫৯৫.৪৫	৫২৪.২০
	মোট	**২৮৬৮.২৩**	**১৬৮৪.৬৭**	**১৬৪৯.৯৯**	**৯৩৯.২৯**

** ১৯৯৫-৯৬ ও ১৯৯৬-৯৭ এ ফসল ঋণ ও কৃষি যন্ত্রপাতি ঋণ একসঙ্গে দেখানো হয়েছে।*

সূত্র ঃ অগ্রণী ব্যাঙ্ক প্রবন্ধক, মুর্শিদাবাদ

বৎসরের কৃষিঋণের ল(্যমাত্রা ও কৃষিঋণ লগ্নীর পরিসংখ্যান সারণী - ৬.২০ তে দেওয়া হ'ল।

সরকারী কৃষিখামার ঃ জেলাতে মোট ২২ টি কৃষিখামার রয়েছে। এর মধ্যে ৬ টি কৃষিখামার দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এবং ১৫ টি কৃষিখামার তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় স্থাপিত হয়। এছাড়াও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১টি আদর্শ কৃষি খামার বহরমপুর ব্লকে স্থাপিত হয়। মূলতঃ এই কৃষি খামারগুলি ব্লক বীজ খামার হিসাবে স্থাপিত হয়েছিল। এই খামারগুলির মোট জমির পরিমাণ ২০-২৫ একরের কিছু কম বেশী। চাষযোগ্য জমি মোটামুটি ২০ একর। এলাকার চাষীদের উন্নত জাতের বীজ ও শংসিত বীজযোগান দেওয়ার জন্য বীজ উৎপাদন করা এইসব কৃষি খামারের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাছাড়াও এইসব কৃষি খামারে এলাকার চাষীদের কৃষি প্রশি(ণ শিবির ক'রে হাতে কলমে প্রশি(ণ দেওয়া হয়।

বস্তুতপ(চাষীদের চাষ সংত্র(ান্ত স্থানীয় সমস্যা সমাধানের জন্য ১৯৮১-৮২ সালে জেলাতে ৪ টি মহকুমা গবেষণা কৃষি খামার স্থাপিত হয়। এর মধ্যে একটি আদর্শ কৃষি খামার বহরমপুরে এবং বাকী ৩টি মহকুমা গবেষণা কৃষি খামার রয়েছে চন্ডীপুর, কান্দী ও সুতিতে। ব্লক কৃষি খামার থেকে রূপান্তরিত করে এই কেন্দ্রগুলিকে মহকুমা গবেষণা খামার করা হয়। এইসব খামারগুলিতে স্থানীয় সমস্যার নিরিখে বিভিন্ন ফসলের বিশেষ জাতের চাহিদা ভিত্তিক বীজ উৎপাদন করা হয়। জেলাতে ২২টি কৃষি খামারের মধ্যে ১৮ টি হচ্ছে ব্লক কৃষি খামার, ১ টি আদর্শ কৃষি খামার, ৩টি মহকুমা গবেষণা কৃষি খামার। এছাড়াও বহরমপুরে ডালশস্য ও তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্রের অধীন জেলা বীজ খামার এবং বেলডাঙ্গায় একটি উপকেন্দ্র বীজ খামার রয়েছে। এগুলোতেও ডালশস্য ও তৈলবীজের বিভিন্ন জাতের উন্নত মানের ও শংসিত বীজ উৎপাদন হয়ে থাকে। এইসব খামারগুলিতে স্থানীয় বিভিন্ন ফসলের উন্নতমানের বীজ ও শংসিত বীজের চাহিদা মেটানোর জন্য বছরে দুটি চাষের বিস্তারিত আগাম পরিকল্পনা করা হয় - তার মধ্যে একটি খরিফ মরশুমে এবং অপরটি রবি মরশুমে।

সারণী- ৬.২১

সরকারী বীজ কৃষিখামারের বিভিন্ন শস্য উৎপাদনের গত ৬ (ছয়) বৎসরের খতিয়ান (মে. টন)

বীজের নাম	১৯৯৪-৯৫	১৯৯৫-৯৬	১৯৯৬-৯৭	১৯৯৭-৯৮	১৯৯৮-৯৯	১৯৯৯-২০০০
১) ধানবীজ	১৮৫.৮৪৩	১৬৩.৪৮০	১৮৪.১০২	১৮৩.২১০	১৮০.৭১৯	২৪১.১৪৮
২) পাটবীজ	৪.১৮১	১.০০৪	০.৪০৬	১.০৫৮	০.৯৩৮	১.৫৮০
৩) সয়াবীন	১০.৭৭৩	৪.৪৯৯	৩.৮০৮	৪.০৫৪	০.৫৭২	---
৪) ভূট্টা	২.০৮৩	১.৮৯২	--	--	--	--
৫) ধঞ্চে	১.৯১৬	২.০০৭	১.৩৯৩	২.২০৯	০.৫৬৭	০.৯০৪
৬) তিল	১.১৮৬	১.৪৭৩	১.৯৪৬	১.৪৭২	১.০১৫	১.৯৯৭
৭) কলাই	১.৯৩৩	০.৭৪৫	১.৮৪০	১.১৫৩	১.৩২৭	২.৪৪০
৮) মুগ	০.৫৫৭	০.২৫৯	০.১৭৯	০.০১০	০.২৩৮	০.২৫১
৯) সরিষা	৭.৮২৪	১০.৭০১	১২.২৬৯	৯.০৮৮	৬.৯১০	৭.০৭৯
১০) গম	৫৫.০১২	৪৪.০৮৫	৫১.১২০	৫৩.১৪৫	২৫.৭৫২	৩৫.০৯৩
১১) ছোলা	৭.৮৩৩	৫.৪০১	৪.০৬৭	২.৬৯২	১.৬৮৮	২.২৩৮
১২) মুসুরী	৪.৮০৯	৬.৬৭২	১১.২৩২	৮.৩৪৮	৫.৯৮৫	৬.০৬৪
১৩) তিসি	০.৪৬৬	০.৩০০	০.৫১২	০.৮০০	০.৪৮০	০.৬৬৬
১৪) খেসারী	৩.৩৪০	৩.৭০১	৪.৮২৬	৫.৮০৮	৬.৭৩০	৭.১১২

সূত্র ঃ মুখ্য কৃষি আধিকারিক, মুর্শিদাবাদ

আদর্শ কৃষি খামার ও মহকুমা গবেষণা কৃষি খামারে বিভিন্ন ফসলের সমস্যা ভিত্তিক চাষ-বাসের পরী(ার জন্য কৃষ(নগর বিভাগীয় কৃষি উপযোগী গবেষণা কেন্দ্রে খরিফ ও রবি মরশুমে চাষের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। যেমন সীমানার বেড়া, সেচ ব্যবস্থার উন্নতি, চাষের জন্য পাওয়ার টিলার সরবরাহ, বলদ সরবরাহ, গুদামঘর সংস্কার ইত্যাদি । বিশেষ কতকগুলি অসুবিধার জন্য এইসব খামারগুলিতে বীজ উৎপাদনের কাজ ব্যাহত হচ্ছিল।

(১) ভর্তুকীতে শংসিত বীজ সরবরাহ ঃ- কৃষি(ত্রে বীজ একটি গু(ত্বপূর্ণ উপকরণ।জেলার কৃষকগণ উন্নতমানের ও শংসিত বীজ ব্যবহারে খুবই সচেতন। এই বীজের চাহিদা ত্র(মশই বাড়ছে। কারণ ফসল উৎপাদনের প্রায় ১৮-২০ শতাংশ নির্ভর করে শংসিত বীজ বা উন্নতমানের বীজের উপর। যদিও শংসিত বীজের চাহিদার তুলনায় যোগান সীমিত তবু এই বীজের চাহিদা যথাসম্ভব মেটানোর জন্য প্রতি বছরই সরকারী বীজখামারে, পঃ বঃ রাজ্য বীজ নিগম এবং সি.এ.ডি.সি.তে বিভিন্ন ফসলের বীজ উৎপাদন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।

তাছাড়া প্রতি বছরে বিভিন্ন বীজ সরবরাহকারী সংস্থা জেলাতে শংসিত/উন্নতমানের বীজ সরবরাহ করে থাকে। জেলার কৃষি বিভাগ ভর্তুকীতে বীজ সরবরাহ প্রকল্প বেশ কিছুদিন থেকে চালু করেছে। সাধারণতঃ ভর্তুকীতে পাট, ধান ও গম বীজ সরবরাহ করা হয়।

২) বিশেষ পাট উন্নয়ন প্রকল্প ঃ কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক আনুকূল্যে বিগত শতাব্দীর আশির দশক থেকে এই প্রকল্পটি চালু হয়েছে। ভর্তুকীর সম্পূর্ণ খরচই বহন করে কেন্দ্রীয় সরকার। পাট উৎপাদন এবং পাশাপাশি পাটের গুণগত মানকে উন্নত করা হ'ল এর উদ্দেশ্য। এই প্রকল্প থেকে কৃষকগণ যে সমস্ত সুবিধা পাচ্ছে সেগুলি হ'ল - (১) ভর্তুকীতে শংসিত বীজ (২) প্রদর্শন (ত্রের যাবতীয় খরচ (৩) ভর্তুকীতে যন্ত্রপাতি/ বীজ বপন যন্ত্র, নিড়ানি যন্ত্র (৪) বিনা পয়সায় খাদ্যের মিনিকিট প্যাকেট (৫) বিনা পয়সায় পাটের পাতায় ইউরিয়া সারের ব্যবহার (৬) পাটের ছাল ছাড়ানো যন্ত্র ও স্প্রেয়ার ইত্যাদি (৭) পাটের গুণগত মান উন্নত করার জন্য বিনা পয়সায় ছত্রাক কালচারের ব্যবস্থা (৮) পাট পচানোর জন্য এককালীন কাচা গর্ত খনন (৯) কৃষকদের প্রশি(ণ ইত্যাদি। জেলাতে বহরমপুর, ডোমকল ও লালবাগ মহকুমার ১২টি ব্লকে এই প্রকল্পটি চালু আছে। ব্লকগুলি হল - বহরমপুর, বেলডাঙ্গা-১, হরিহরপাড়া, নওদা, ডোমকল, জলঙ্গী, মুর্শিদাবাদ-জিয়াগঞ্জ, রাণীনগর-১, রাণীনগর-২, ভগবানগোলা-১, ভগবানগোলা-২ ও লালগোলা।

৩) নিবিড় দানাশস্য উন্নয়ন প্রকল্প ঃ এই প্রকল্পটি বিগত শতাব্দীর নব্বই-এর দশক থেকে জেলার ৫টি ব্লকে চলছে। ব্লকগুলি হ'ল -

সারণী- ৬.২২

এক নজরে জেলার কৃষি খামারগুলির পরিকাঠামো

কৃষিখামার	মোট আয়তন (হেক্টর)	মোট চাষ -যোগ্য জমি (হেক্টর)	কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক	সহকারী ে(ত্রপাল	পাওয়ার টিলার ড্রাইভার	অগভীর নলকূপ	পুকুর	গভীর নলকূপ	সেচ সেবিত এলাকা	যন্ত্র চালিত লাঙ্গল	বলদ	গোর(ক	চৌকিদার	কৃষিশ্রমক	নৈমিত্তিক শ্রমিক
বহরমপুর	১০.৬৫	৬.৬৮	১	—	—	৪	১	১	৬.১৮	১	—	-	১	২০	-
হরিহরবাড়া	১০.০০	৮.৪০	—	১	১	৩	১	১	৮.৪০	১	১	১	০	১৯	১
নওদা	৯.৯২	৮.০৮	—	১	—	—	১	১	৬.০০	১	—	১	১	২০	-
ডোমকল	১০	৮.২০	—	—	১	—	১	১	৫.০০	১	—	১	১	২১	-
জলঙ্গী	১০.২৭	৮.২০	—	১	—	১	—	—	১.০০	১	—	১	১	১৮	-
চন্ডীপুর	১০.২৭	৮.২০	১	১	১	৩	—	১	৮.০০	১	২	১	১	২৮	-
লালগোলা	১০.০০	৮.০০	—	১	—	৩	—	১	৭.০০	১	৪	১	১	১৯	১
ভগবানগোলা-১	১০.৬১	৯.৮০	—	১	১	৩	—	—	৬.০০	১	২	২	-	২৮	১
রাণীনগর-১	১০.০০	৮.৮৬	—	১	১	১	—	১	৬.০০	১	২	১	১	২০	১
নবগ্রাম	৯.৭০	৮.৫২	—	১	১	—	১	১	৪.০০	১	৪	১	১	১৩	-
কান্দী	১০.০০	৭.২০	১	১	১	১	১	১	৭.০০	১	—	১	১	২৫	-
খড়গ্রাম	৯.৯৮	৭.৮০	—	১	১	—	১	১	৪.০০	১	১	১	-	২১	৪
বড়এ(া	১০.৩০	৭.১৭	—	১	—	১	১	—	২.০০	১	২	১	১	১৫	-
ভরতপুর-১	১০.৬০	৮.৪০	—	১	১	২	১	—	২.০০	১	২	১	১	২০	-
ভরতপুর-২	৯.৮৪	৭.৯২	—	১	—	—	—	—	—	১	—	১	-	১৫	-
রঘুনাথগঞ্জ-১	১০.১৪	৮.০০	—	১	১	—	২	—	১.৫০	১	—	-	১	১৬	১
রঘুনাথগঞ্জ-২	১০.০০	৯.২০	—	১	—	৩	১	—	৫.০০	১	—	১	-	১৮	-
সুতি-১	৪.০০	৩.২০	—	১	১	১	—	—	১.০০	—	২	-	১	১০	-
সুতি-২	১০.৪৭	৮.৪৭	১	১	১	৩	—	—	৩.০০	১	২	১	১	৩৪	-
সামশেরগঞ্জ	১০.০০	৮.২০	—	১	—	৩	১	—	৩.০০	১	২	১	-	২০	-
ফরাক্কা	১০.১৩	৮.২০	—	১	—	৩	—	—	৩.০০	১	২	-	-	২০	-
সাগরদীঘি	১০.০০	৮.০০	—	১	১	—	২	—	১.০০	১	—	-	-	১৫	-
মোট						৩৫	১৫	১০	৬৯.০৮	২১	২৬	১৭	১৪	৪৩৫	৯

সূত্র ঃ মুখ্য কৃষি আধিকারিক, মুর্শিদাবাদ

ডোমকল, নওদা, মুর্শিদাবাদ-জিয়াগঞ্জ, লালগোলা এবং সাগরদীঘি। দানাশস্য, যেমন- ধান ও গমের উৎপাদনের হার জাতীয় স্তরের উৎপাদনের সমক(করাই হ'ল এই প্রকল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই প্রকল্পের মোট খরচের ৭৫ ভাগ কেন্দ্রীয় সরকার এবং বাকী ২৫ ভাগ রাজ্য সরকার বহন করে থাকে। এই প্রকল্প থেকে কৃষকগণ যেসব সুবিধা পাচ্ছেন সেগুলি হ'ল- (১) ভর্তুকীতে শংসিত ধান ও গম বীজের সরবরাহ (২) এক একর জমির প্রদর্শন(ত্র (খরিফ ও রবি মরশুমে) , (৩) সুসংহত উপায়ে রোগ-পোকা নিয়ন্ত্রণের প্রদর্শন এবং কৃষক প্রশি(ণ, (৪) বোরো মরশুমে এক একরের সংকর জাতীয় ধানের প্রদর্শন(ত্র, (৫) ভর্তুকীতে কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ, (৬) কৃষক প্রশি(ণ এবং (৭) ভর্তুকীতে পাওয়ার টিলার ও ঝরণা সেচের সরবরাহ ইত্যাদি।

৪) ডালশস্য উন্নয়ন প্রকল্প ঃ এই উন্নয়ন প্রকল্প সব ব্লকেই চলছে। এই প্রকল্পে কৃষকদের মধ্যে এক বিঘার প্রদর্শন (ত্রের জন্য বিভিন্ন ডালশস্যের শংসিত বীজ সরবরাহ করা হয়ে থাকে। শংসিত বীজ ব্যবহার করে (ুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকেরা যাতে ডালশস্যের উৎপাদনের হার বাড়াতে পারে সেটাই হ'ল এই প্রকল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য।

৫) জাতীয় ডালশস্য উন্নয়ন প্রকল্প ঃ এই প্রকল্প কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে বিগত শতাব্দীর আশির দশক থেকে চলছে। মোট খরচের ৭৫ ভাগ কেন্দ্রীয় সরকার এবং বাকী ২৫ ভাগ রাজ্য সরকার বহন করে। দ্বিতীয় পর্যায়ে এই জেলার ৫টি ব্লকে এই প্রকল্প চালু আছে। ব্লকগুলি হ'ল, হরিহরপাড়া, জলঙ্গী, রাণীনগর-১নং, সুতি- ২নং এবং ফরাক্কা। ডালশস্য চাষের এলাকা এবং উৎপাদন বাড়ানো এই প্রকল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই প্রকল্প থেকে কৃষকেরা যেসব সুবিধা পাচ্ছেন সেগুলি হ'ল- (১) এক বিঘা জমির বিভিন্ন ডালশস্যের শংসিত বীজ-মিনিকিট, (২) বিভিন্ন ডালশস্যের ব্লক প্রদর্শনী(ত্র, (৩) ভর্তুকীতে কীটনাশক যন্ত্রপাতি সরবরাহ, (৪) সুসংহত উপায়ে রোগ-পোকা নিয়ন্ত্রণের প্রদর্শন(ত্র এবং প্রশি(ণ, (৫) ডালশস্য উৎপাদনের জন্য বিনা পয়সায় জীবাণুসারের ব্যবহার ইত্যাদি।

৬) তৈলবীজ উন্নয়ন প্রকল্প ঃ রাজ্য সরকারের এই প্রকল্প সব ব্লকেই চালু আছে। (ুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের এক বিঘা জমির জন্য বিভিন্ন তৈলবীজের শংসিত বীজ সরবরাহ করা হয়। শংসিত বীজ ব্যবহারে উৎসাহিত করা এবং উৎপাদন বাড়ানো এই প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য।

৭) তৈলবীজ উৎপাদন প্রকল্প ঃ কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে এই প্রকল্প বিগত শতাব্দীর আশির দশক থেকে চালু আছে। মূলতঃ কৃষি প্রযুক্তি(র প্রবর্তনে এবং কৃষকদের উৎসাহিত করে মোট তৈলবীজের এলাকা ও উৎপাদন বাড়ানো এই প্রকল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই প্রকল্প জেলার সব ব্লকেই চলছে। প্রকল্পের মোট খরচের ৭৫ ভাগ কেন্দ্রীয় সরকার এবং বাকী ২৫ ভাগ রাজ্য সরকার বহন করে থাকে। এই প্রকল্প মারফৎ কৃষকদের যেসব সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে সেগুলি হ'ল - (১) এক বিঘা জমির জন্য বিভিন্ন তৈলবীজের শংসিত বীজ সরবরাহ, (২) বিভিন্ন তৈলবীজের প্রদর্শন(ত্র, (৩) সুসংহত উপায়ে রোগ-পোকা নিয়ন্ত্রণের প্রদর্শন(ত্রে এবং ১০ সপ্তাহের কৃষক প্রশি(ণ এবং (৪) ভর্তুকীতে কীটনাশক যন্ত্রপাতি সরবরাহ।

৮) ই(উন্নয়ন প্রকল্প ঃ রাজ্য সরকারের এই প্রকল্প ই(প্রকল্পের এলাকা ছাড়া জেলার সব কটি ব্লকেই চালু আছে। এই প্রকল্প থেকে জেলার কৃষকগণ নানাভাবে ই(চাষে উৎসাহিত ও উপকৃত হচ্ছেন। তারই সুবাদে চাষের এলাকা ও উৎপাদন বাড়ানো এই প্রকল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই প্রকল্প থেকে কৃষকদের যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে সেগুলি হ'ল - (১) নার্শারী প্রদর্শন(ত্র, (২) সাথী ফসলের প্রদর্শন(ত্র, (৩) মুড়ি আখের প্রদর্শন(ত্র, (৪) বীজ আখ উৎপাদনের জন্য প্রদর্শন(ত্র, (৫) ভর্তুকীতে কীটনাশক যন্ত্রপাতি সরবরাহ এবং (৬) কৃষকদের প্রশি(ণের ব্যবস্থা।

৯) সহনীয় ই(উন্নয়ন প্রকল্প ঃ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে এই প্রকল্পের কাজ চলছে। বহরমপুর, বেলডাঙ্গা-১নং, এবং বেলডাঙ্গা-২নং ব্লক ছাড়া জেলার সব ব্লকেই এই প্রকল্প চালু আছে। প্রকল্পের মোট খরচের ৭৫ ভাগ কেন্দ্রীয় সরকার এবং অবশিষ্ট ২৫ ভাগ রাজ্য সরকার বহন করে থাকে। ই(চাষকে লাভজনক করে চাষীদের ই(চাষে উৎসাহিত করা এই প্রকল্পের প্রধান ল(্য। এই প্রকল্প থেকে (১) প্রদর্শন(ত্র, (২) বীজ উৎপাদনের প্রদর্শন(ত্র, (৩) আখের উৎপাদনের নিরিখে পুরস্কৃত করার জন্য প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা এবং (৪) আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি(র নিরিখে কৃষক বন্ধুদের প্রশি(ণের ব্যবস্থা ইত্যাদি করা হয়।

১০) গ্রামীণ সার্বিক শি(া প্রকল্প ঃ রাজ্য সরকারের এই প্রকল্পে ৩-৫ দিনের কৃষক প্রশি(ণ শিবিরের ব্যবস্থা আছে। বিভিন্ন ব্লকে কৃষি মেলা বা কৃষি প্রদর্শনী উপল(এই প্রশি(ণ শিবির স্থাপন করা হয়। মূলতঃ গ্রামীণ এলাকার বিভিন্ন স্তরের মানুষ এইসব মেলায় আসে এবং এই কৃষক প্রশি(ণ শিবিরের মাধ্যমে সঠিক শি(াগ্রহণ করে। তাছাড়াও কৃষি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা থাকার জন্য এলাকার চাষীরা কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ও উৎসাহিত হন।

১১) কৃষক প্রশি(ণ প্রকল্প ঃ এই প্রকল্প কৃষির অগ্রগতিকে তরান্বিত করতে সাহায্য করে। কারণ আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি(র বিভিন্ন তথ্য এই প্রশি(ণ প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া

হয়। কৃষি(ত্রে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি(র প্রবর্তন কৃষির উৎপাদনের হারকে বাড়াতে সাহায্য করে, তাই কৃষির অগ্রগতির (ে ত্রে এই প্রকল্পের বিরাট অবদান রয়েছে। বর্তমানে এই প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষক সন্তানদের তিন দিনের প্রশি(ণের ব্যবস্থা আছে। তাছাড়াও কৃষকদের নিয়ে এক দিনের শি(ণ শিবিরের ব্যবস্থা আছে। এছাড়াও কৃষকদের নিয়ে রাজ্যের মধ্যে ও রাজ্যের বাহিরেও কৃষি বিষয়ক শি(ামূলক ভ্রমণের ব্যবস্থা আছে। যার ফলে বিভিন্ন এলাকার চাষবাসের প্রযুক্তি(গত তথ্য সংগ্রহ ও আদান প্রদান হয়ে থাকে।

১২) জৈব সার উৎপাদন ও সার-গর্ত খনন প্রকল্প ঃ বর্তমানে কৃষির উৎপাদনের ধারাকে বজায় রাখতে সঠিক মাত্রায় জৈব সারের ব্যবহার অপরিহার্য। কারণ বছরে বহুবিধ ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে চাষের নিবিড়তা বেড়ে চলেছে। পাশাপাশি মাটির স্বাস্থ্য ও মাটির বিভিন্ন উপাদানের গুণাগুণের অস্তিত্বও বজায় রাখার প্র(বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। জৈব সারের উৎপাদন বিভিন্ন কারণে কমে আসছে। তাই শস্য পর্যায়ের মধ্যে একটি শুটি জাতীয় ফসল বা সবুজ সারের অর্ন্তভুক্তি(বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। কৃষকদের জৈবসার উৎপাদন ও পাকা সারের গর্ত খনন প্রকল্প সম্বন্ধে সজাগ করা হচ্ছে যাতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পাকা সারের গর্তে জৈব সারের উৎপাদন করা যায় এবং এর সঠিক মাত্রার ব্যবহারে জমির স্বাস্থ্য বজায় থাকে। বর্তমানে কৃষকদের উৎসাহিত করার জন্য ৩০০০ টাকা করে সাহায্য করা হচ্ছে।

১৩) শস্যর(া কীটনাশক ঔষধপত্রের মান নির্ণয় প্রকল্প ঃ কীটনাশক ঔষধপত্রের যথেচ্ছ ব্যবহারে দৈনন্দিন জীবনে অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয় - পরিবেশ দূষণ তার মধ্যে অন্যতম। তাই কৃষি বিজ্ঞানের সৌজন্যে ফসলের রোগ-পোকা নিয়ন্ত্রণে কীটনাশক ঔষধ পত্রের প্রয়োগে আমূল পরিবর্তন আনা হয়েছে। তার সুবাদে শস্যর(া প্রকল্পে ১৯৯৫-৯৬ সাল থেকে জেলাতে ফসল পরিদর্শন করে সুসংহতভাবে রোগ-পোকা নিয়ন্ত্রণের কর্মসূচী (আই. পি. এম) গ্রহণ করা হয়েছে। এর মুখ্য উদ্দেশ্য হল কীটনাশক ঔষুধপত্রের যথেচ্ছ ব্যবহার বন্ধ করা ও ফসলের সম্ভাব্য ফলন ঠিক রাখতে প্রয়োজন ভিত্তিক কীটনাশক ঔষধ প্রয়োগ করে বন্ধু ও শত্রু পোকার ভারসাম্য বজায় রাখা এবং অপরদিকে পরিবেশকে যথাসম্ভব দূষণমুক্ত(রাখা। জেলাতে এই প্রকল্পটি চালু হওয়ার পর ধান, তৈলবীজ ও ডালশস্যের উপর প্রায় ৪০ টি, আই. পি. এম- এর প্রদর্শন(ত্র চালু করা হয় এবং প্রায় ১৫০০ জন কৃষককে হাতে কলমে এ বিষয়ে প্রশি(ণ দেওয়া হয়। এছাড়াও শস্যর(া প্রকল্পে ভরতুকিতে কীটনাশক ঔষুধপত্র ছড়ানোর যন্ত্রপাতি সরবরাহের ব্যবস্থা আছে। তাছাড়াও ফসলে রোগ-পোকার ব্যাপকহারে আত্র(মণ হলে কৃষকদের ৫০ শতাংশ হারে ভর্তুকীতে ঔষধপত্র সরবরাহ করা হয়।

এই শস্যর(া প্রকল্পে কীটনাশক ঔষধপত্রের গুণগতমান ঠিক রাখার জন্য জেলার বিভিন্ন প্রান্তের কীটনাশক বিপণন কেন্দ্র থেকে ঔষধের নমুনা সংগ্রহ করে পরী(াগারে মান নির্ণয় করা হয়। এর সুবাদে নিম্নমানের কীটনাশক ঔষধপত্র বিক্রি(বন্ধ করা সম্ভবপর হয় এবং ফলস্বরূপ চাষীরা উপকৃত হন।

১৪) আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ প্রকল্প ঃ আধুনিক কৃষি পরিকাঠামোয় উন্নত কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার অপরিহার্য। এই যন্ত্রপাতির ব্যবহারে একদিকে যেমন ফসল উৎপাদনের ল(্যমাত্রা পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে, অপরদিকে চাষের খরচও আশাতীতভাবে কমছে। এইসব উন্নত যন্ত্রপাতির মধ্যে বর্তমানে পাওয়ার টিলার এবং ট্রাকটারের উপর জেলার কৃষকগণ বেশী নির্ভরশীল। কারণ বলদ-লাঙ্গলের দাম অত্যধিক বেড়ে যাওয়ায় চাষের খরচ বেড়ে গেছে, তাছাড়াও অল্প সময়ের মধ্যে জমি তৈরী করা সম্ভবপর হচ্ছে। অন্যান্য যন্ত্রপাতি যেমন বীজবপন, ফসল নিড়ানী যন্ত্র, স্প্রেয়ার, ডাস্টার এর ব্যবহার অনেকদিন থেকে চলে আসছে। আর একটি প্রয়োজনীয় কৃষি যন্ত্রপাতি হচ্ছে ধান ও গম ঝাড়াই যন্ত্র। এর প্রয়োজনীয়তা দিন দিন বেড়ে চলছে। এইসব আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প থেকে প্রতি বছরই ভর্তুকীতে জেলার কৃষকদের বিতরণ করা হচ্ছে। আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি চালানো, মেরামতি শি(ণের জন্য কৃষক সন্তানদের ৯০ দিনের প্রশি(ণেরও ব্যবস্থা আছে।

১৫) কৃষক বার্ধক্য ভাতা প্রকল্প ঃ এই প্রকল্প ১৯৮০ সাল থেকে শু(হয়। যে সব কৃষক ৬০ বছরের বেশী বয়স হওয়ার জন্য বার্ধক্যজনিত কারণে কর্ম(মতা হারিয়ে ফেলেন তাদের মাসে ১০০ টাকা করে আর্থিক সাহায্য করা এই প্রকল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই জেলাতে ১৯৮০ সাল থেকে ১৪২৫ জন বিভিন্ন শ্রেণীর কৃষক এই প্রকল্পের মাধ্যমে মাসিক ১০০ টাকা করে আর্থিক সাহায্য পেয়ে এসেছেন। ১৯৯৭ সাল থেকে বার্ধক্য ভাতা বাড়িয়ে মাসিক ৩০০ টাকা করা হয়েছে এবং বর্তমানে জেলাতে ১৩৭৫ জন কৃষক বার্দ্ধক্য ভাতার সুযোগ পাচ্ছেন।

১৬) বিভিন্ন ফসলের বীজ মিনিকিট এবং তার সরবরাহ ঃ জেলার (ুদ্র চাষীদের এক বিঘা জমির শংসিত বীজ বিনা পয়সায় সরবরাহ করে উৎপাদন বাড়ানোর প্রয়াস এই প্রকল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য। বীজ মিনিকিটের সরবরাহ বিগত শতাব্দীর আশির দশক থেকে চলে আসছে। পাশাপাশি শংসিত বীজ ব্যবহারের যৌক্তি(কতা বর্তমানে কৃষকদের অজানা নেই, ফলে এর চাহিদা উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে।

বর্তমানে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি(র প্রবর্তনে সঙ্কর বীজের উদ্ভাবন সম্ভব হয়েছে। মূলতঃ সব্জী বীজের মধ্যে ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটো, বেগুন ইত্যাদি এবং ধানের সংকর বীজ মিনিকিটের মাধ্যমে

কৃষকদের সরবরাহ শু(হয়েছে।

এছাড়াও জেলাতে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে প্রতি বছরই কৃষি(ত্রে বিপুল পরিমাণে শস্যহানি হয়ে থাকে। ১৯৯৯ এবং ২০০০ সালের বন্যার দাপটে জেলায় কৃষির অর্থনীতি ভীষণভাবে (তিগ্রস্ত হয়। রাজ্য সরকার শস্যহানির জন্য (তিগ্রস্ত কৃষকদের সব রকম শংসিত মিনিকিটের বীজ সরবরাহ করে রবি মরশুমে উৎপাদনের মাত্রা বাড়াবার চেষ্টা করছেন এবং সেইসঙ্গে আংশিক (তিপূরণ করার চেষ্টা করছেন।

কৃষি পরিকাঠামো ঃ কৃষি বিভাগে রয়েছে সম্প্রসারণ ও গবেষণা শাখা। এই দুই শাখার সময়মত ব্যবহার, কৃষি উপকরণের সময়মত সরবরাহ, সময়মত কৃষিঋণের ব্যবস্থা, কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য ও সহায়ক মূল্য এবং তৎসহ কৃষি পণ্য বিত্রি(র নিয়ন্ত্রিত বাজার, সর্বোপরি যোগাযোগ ও পরিবহণের সুযোগ ইত্যাদি হচ্ছে পরিকাঠামোর মূল উপকরণ।

কৃষি বিভাগের সম্প্রসারণ শাখার কর্মচারীদের আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি(বিষয়ক প্রশি(ণ ও পাশাপাশি নিয়মিত মাঠ পরিদর্শন (প্রশি(ণ ও পরিদর্শন কর্মসূচী) খুবই সার্থক কৃষি সম্প্রসারণ কর্মসূচী বলে চিহ্নি(ত হয়েছে। বি(ব্যাঙ্কের সহায়তা ও সুপারিশ মত ১৯৭৫ সালে এই রাজ্যে তথা এই জেলাতে কৃষি বিভাগে এই কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছিল। কৃষি বিভাগের সম্প্রসারণ শাখার তদানীন্তন কর্মচারীদের নিয়ে এই কর্মসূচী গ্রহণ করা হলেও বস্তুতপ(১৯৮১ সাল থেকে 'কৃষি প্রযুক্তি(সহায়ক' নামে নূতন পদ সৃষ্টি ক'রে কর্মচারী নিয়োগ করা হয় এবং এই কর্মসূচী চালু হয়।

প্রশি(ণ ও পরিদর্শন কর্মসূচীর মুখ্য উদ্দেশ্য ঃ সম্প্রসারণ শাখার গ্রামীণ স্তরের কর্মচারী নিয়মিত কৃষকদের সাথে যোগাযোগ, মাঠ পরিদর্শন, কৃষকদের সময়োপযোগী কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন প্রযুক্তি(/তথ্য সরবরাহ করেন, মাঠের সমস্যা সমাধানের জন্য বিশেষজ্ঞের বা বিভাগীয় গবেষণা শাখার গোচরে আনেন এবং আবার সমাধানের সুপারিশগুলো কৃষকদের কাছে পৌঁছে দেন।

জাতীয় জলবিভাজিকা উন্নয়ন প্রকল্প

ভারত সরকারের কৃষি ও সমবায় মন্ত্রক দ্বারা বৃষ্টি নির্ভর এলাকায় জাতীয় জলবিভাজিকা উন্নয়ন প্রকল্পটি অষ্টম-পঞ্চমবার্ষিকী পরিকল্পনায় গৃহীত হয়েছে। এটি একটি দীর্ঘ মেয়াদী প্রকল্প। এই প্রকল্পে বরাদ্দকৃত অর্থ শতকরা ৭৫ ভাগ ভর্তুকী ও ২৫ ভাগ ঋণ হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকার মঞ্জুর করবেন। যে সব ব্লকে মোট জমির শতকরা ৫০ ভাগ কৃষিকার্যে ব্যবহৃত হয় ও চাষযোগ্য জমির শতকরা ৩০ ভাগের কম সেচ-সেবিত, সেই ব্লকেই কেবল এই প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

জলবিভাজিকা হল এমন এক ভূখন্ড যেখানে বৃষ্টিছায় অঞ্চলের বৃষ্টির জল-কাদা কোন এক সাধারণ নালা দিয়ে গড়িয়ে যায়। তাই এই বৃষ্টিছায় অঞ্চলে বৃষ্টির মাধ্যমে পাওয়া জলের সংর(ণের ব্যবস্থা করা এবং তার সাথে ভূমি(য় রোধের ব্যবস্থা নেওয়াই হ'ল এই প্রকল্পের মূল ল(্য। সাথে আছে বহুমুখী উন্নয়ন প্রকল্প যেমন কৃষি, পশুপালন, মৎস্যচাষ, সমাজভিত্তিক বনসৃজন, গ্রামীণ কুটীর শিল্প, ভূমি উন্নয়ন, পুষ্করিণী সংস্কার ইত্যাদি। এই প্রকল্পের মূল ল(্য বহুমুখী উন্নয়নমূলক কাজ, যেমন, অসেচ এলাকায় সংর(ত বৃষ্টির জলের সদ্ব্যবহার, ভূমি(য় রোধ, সামাজিক বনসৃজন, পশুপালন, কুটীর শিল্পের উন্নয়ন ইত্যাদির মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মসংস্থানের সুযোগ ক'রে ঐ এলাকার সার্বিক উন্নয়ন করা।

প্রকৃতির খামখেয়ালীর উপর নির্ভর করে বৃষ্টি নির্ভর এলাকায় চাষ হয়ে থাকে। কোনো বৎসর ভাল বৃষ্টি হলে এবং সেই বৃষ্টি যদি নির্দিষ্টভাবে হয়ে থাকে তাহলে সেই বৎসর উৎপাদন ভাল হয়। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বৃষ্টি নির্ভর এলাকায় উৎপাদন বার বার (তিগ্রস্ত হয়ে আসছে। সেচসেবিত এলাকার কৃষির উন্নতির জন্য উন্নত বীজ, সার, কীটনাশক ঔষধ এবং সর্বোপরি প্রযুক্তি(র মাধ্যমে সবুজ বিপ-ব আনা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু বৃষ্টি নির্ভর এলাকায় সেরকম কোন উন্নত প্রযুক্তি(র সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি, সেইজন্য সকলের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হলে বৃষ্টি নির্ভর এলাকায় চাষযোগ্য জমির উন্নতিসহ বৃষ্টিছায় এলাকার জলের সদ্ব্যবহার করে খাদ্যের ল(্যমাত্রায় পৌঁছাতে হবে তার জন্য প্রয়োজনে উন্নত প্রযুক্তি(তে বৃষ্টির জল সংর(ণ করে সেচের সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে এবং তা করতে হলে প্রয়োজন মজে যাওয়া জলাধারগুলির সংস্কার ও নতুন উৎসের উদ্ভাবন।

ভূমি(য়ের ফলে নিকাশী নালা বা পুকুর মজে যাওয়ার ফলে বর্ষাকালে বৃষ্টির জল এবং নদীনালার জলে জলমগ্ন হয়ে চাষের প্রভূত (তি হয়। এইসব এলাকায় নিকাশী ব্যবস্থার উন্নতি করে, নতুন নালার ব্যবস্থা করে এবং জলাধারের ব্যবস্থা করে মৎস্যচাষে সহায়তা করা এবং উন্নত কৃষি প্রযুক্তি(র ব্যবহার এই প্রকল্পের একটি উদ্দেশ্য। জলাধারের সঞ্চিত জল ব্যবহার করে রবি মরশুমে এবং গ্রীষ্মকালের ফসল উৎপাদন সম্ভব হবে।

বছরের একটি মাত্র ফসল হওয়ায় বৃষ্টি নির্ভর এলাকায় বছরের বেশীর ভাগ সময়ই ঐ এলাকার বাসিন্দারা কর্মসংস্থান থেকে বঞ্চিত হয়। এই প্রকল্পের মাধ্যমে পশুপালন, বনসৃজন, মাছচাষ, মৌমাছি পালন, বিভিন্ন (দ্র কুটীরশিল্প ইত্যাদির দ্বারা শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়।

এই প্রকল্পের মূল ল(্য বিজ্ঞানসম্মতভাবে বৃষ্টির জল সংর(ণ, সুসংহত চাষের পদ্ধতি, কৃষিভিত্তিক শিল্পের উন্নতি, জমির মান উন্নয়ন ক'রে নতুন শ্রমদিবস সৃষ্টি ক'রে প্রকল্পভুক্ত(এলাকার সার্বিক উন্নয়ন তথা জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নতিসাধন।

ডালশস্য এবং তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্র

পশ্চিমবাংলার কৃষক আবহমান কাল থেকে দৈনন্দিন যোগান মেটাতে ধান, ডালশস্য ও তৈলবীজের চাষ করে আসছেন। খাদ্য গুণাগুণের মান ও গু(ত্বের দিক থেকে ডালশস্য ও তৈলবীজ আপামর জনগণের কাছে বহু অতীত থেকেই সমাদৃত। দেশের জনসংখ্যার বৃদ্ধি এবং আবহাওয়া ও পরিস্থিতির পরিবর্তনে যে সব সমস্যার উদ্ভব, বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি(দিয়ে তার সমাধানকল্পে স্বাধীনতার পূর্বেই কিছু চিন্তাভাবনা শু(হয়। ১৮৮৫ সালে রয়্যাল কমিশনের (রয়্যাল কমিশন অ্যাণ্ড এগ্রিকালচার) সুপারিশ অনুযায়ী প্রথম 'কৃষি বিভাগ' (Department of Agriculture) আত্মপ্রকাশ করে। গবেষণামূলক ত্রি(য়াকর্ম প্রধানতঃ কেন্দ্রীভূত থাকে তদানীন্তন অবিভক্ত(বঙ্গদেশের ঢাকায় এবং পরী(ামূলক কাজকর্ম ছড়িয়ে দেওয়া হয় জেলার বিভিন্ন কৃষি খামারগুলিতে। এরই ফলশ্রুতি হিসাবে ১৯২৮ সালে মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে 'রাজ্য কৃষি খামার' (State Agriculture Farm) আত্মপ্রকাশ করে। যা এতদিন 'কোম্পানী বাগান' হিসাবে নীলচাষের জন্য খ্যাতছিল তা রূপান্তরিত হয় রাজ্য বীজ খামারে। চাষীভাইদের হাতে বিভিন্ন ফসলের বীজ তুলে দেবার জন্য শু(হয় বিভিন্ন ফসলের নিবিড় চাষ এবং পরী(ামূলকভাবে ডালশস্য ও তৈলবীজের চাষ শু(হয় তখন থেকেই।

ত্রিশ দশকের মাঝামাঝি সময়ে দ্বিজদাস দত্ত প্রথম অর্থকরী উদ্ভিদবিদ্ হিসাবে এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন এবং তিনিই ডালশস্য ও তৈলবীজের উপর প্রথম গবেষণামূলক কাজ শু(করেন। ১৯৪০ সালে দ্বিতীয় অর্থকরী উদ্ভিদবিদ্ পদে আসীন হন ডঃ পি জে গ্রেগরী। তাঁর ঐকান্তিক এবং নিরলস প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি হিসাবে ডাল ও তৈলবীজের বিভিন্ন নতুন জাত উদ্ভাবিত হয়েছিল যা দেশে ও বিদেশে বিশেষ সুনাম অর্জন করেছিল।

স্বাধীনতা উত্তর যুগে সমগ্র গবেষণামূলক কাজকর্ম স্থানান্তরিত হয় চুঁচুড়ায় (যা বর্তমানে ধান্য গবেষণা কেন্দ্র নামে খ্যাত)। একজন মাত্র রিসার্চ অ্যাসিসট্যান্টের তত্ত্বাবধানে বহরমপুরে ডালশস্য ও তৈলবীজের কাজ অব্যাহত থাকে। ডালশস্যের অপরিসীম গু(ত্ব উপলব্ধি করে এবং সুষ্ঠু গবেষণামূলক কাজের মূল্যায়ণের বিচার করে ১৯৫০ সালে ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ (Indian Council of Agriculture Research) 'পশ্চিমবঙ্গের ডালশস্যের গবেষণা' (Research on Pulses in West Bengal) নামে একটি নতুন প্রকল্পের অনুমতি প্রদান করে। ঐ বছরেই তৈলবীজের উপর গবেষণার জন্য অনুরূপ আরও একটি প্রকল্প অনুমোদিত হয়। তদানীন্তন বহরমপুর বীজ খামারে প্রারম্ভিক গবেষণার কাজ পুষ্পিত ও পল্লবিত হয়ে ত্র(মশঃ জন্ম দেয় বর্তমানের ডালশস্য ও তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্রের (১৯৫০)। ডালশস্য ও তৈলবীজের বিপুল চাহিদা ও অপরিসীম গু(ত্ব অনুধাবন করে তৎপরবর্তী পর্যায়ে বহরমপুর থেকে ২০ কিমি দূরে বেলডাঙ্গায় এই গবেষণা কেন্দ্রের অধীনে আরও একটি কৃষি খামারের সূচনা হয়। বর্তমানে ডালশস্য ও তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্রটি ৬০ একর জমির উপর অবস্থিত, যার মধ্যে কৃষিযোগ্য জমির পরিমাণ প্রায় ৩৪ একর। ৩১ জন কৃষি বিজ্ঞানী, ১৫ জন কৃষিপ্রযুক্তি(সহায়ক, ৩৫জন অফিস কর্মচারী এবং ৭৪ জন কৃষি শ্রমিক নিয়ে এই গবেষণা কেন্দ্র আজ দেশ ও দশের কাজে আত্মনিমগ্ন। সর্বোপরি, বিভিন্ন কৃষি বিষয়ক পুস্তক, বিভিন্ন তথ্যাদিপূর্ণ দেশী ও বিদেশী পত্রপত্রিকা সমৃদ্ধ এই কেন্দ্রের পাঠাগার, গবেষণাগার এবং যাদুঘরও বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে।

একনিষ্ঠ গবেষণার ফলশ্রুতি হিসাবে ডালশস্য ও তৈলবীজের অনেক উন্নত জাত, বিভিন্ন চাষ-পদ্ধতির প্রয়োগ, রোগ ও পোকা মাকড়ের প্রতিরোধ উদ্ভাবনে বিগত তিন দশক ধরে উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করা গেছে। এই গবেষণা কেন্দ্র থেকে উদ্ভাবিত কলাই, মুগ, মসুর, ছোলা, খেসারি, সরিষা, রাই, তিল, কুসুম প্রভৃতির উন্নত, উচ্চফলনশীল এবং স্বল্পমেয়াদী জাত শুধুমাত্র এই রাজ্যেই নয়, সমগ্র দেশে আজ বিশেষভাবে সমাদৃত। এই কেন্দ্র থেকেই উদ্ভাবিত হয়েছে খেসারির নতুন জাত 'নির্মল' - যা খেলে প(াঘাতের কোন আশঙ্কা নেই। খেসারীর ডালে আর ভয় নাই, জাতটা 'নির্মল' হওয়া চাই, এই বহুল প্রচলিত কথা চাষীদের খেসারী চাষে নতুন আগ্রহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছে। এছাড়া কলাই এর জাত 'সারদা', 'গৌতম', 'কালিন্দী', মুগের 'সোনালী', 'পান্না', ছোলার ' মহামায়া-১', 'মহামায়া-২' ও 'অনুরাধা', মটরের 'ধূসর' এবং মসুরের 'রঞ্জন', 'সুব্রত' এবং 'আশা' চাষীদের মনে নতুন আশার সঞ্চার করেছে। তৈলবীজের মধ্যে শ্বেত সরিষার 'বিনয়', 'সুবিনয়' এবং 'ঝুমকা', টোরির 'অগ্রণী' ও 'পাঞ্চালী', রাই-এর 'সীতা', 'সরমা', 'সংযুক্ত(া অসেচ', তিসির 'নীলা' ও 'গরিমা', তিলের 'তিলোত্তমা' এবং 'রমা' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই কেন্দ্রের উদ্ভাবিত শস্যপরিচর্যা ও শস্যর(ার প্রযুক্তি(পশ্চিমবঙ্গের কৃষক ছাড়াও প্রতিবেশী রাজ্য যেমন, উড়িষ্যা, আসাম, মেঘালয় ও ত্রিপুরাকে সমৃদ্ধ করেছে। আজ তাই সমগ্র পূর্ব ভারতের ডালশস্য ও তৈলবীজের একমাত্র প্রধান গবেষণা কেন্দ্র হিসাবে এটি আত্মমর্যাদা লাভ করতে সমর্থ হয়েছে।

শুধুমাত্র রাজ্য এবং জাতীয় স্তরে বিভিন্ন প্রকল্পের সার্থক রূপায়ণের মাধ্যমেই নয় - আর্ন্তজাতিক সংস্থা যথা 'ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার অন এরিড রিসার্চ ফর ড্রাই এরিয়া (ইকারডা), সিরিয়া এবং ইন্টারন্যাশনাল ত্র(প রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর সেমি-এরিড ট্রপিকস্ (ইনরিস্যাট), হায়দ্রাবাদ' - এই দুটি আর্ন্তজাতিক গবেষণা সংস্থার সংযোগে যৌথভাবে গবেষণার ফলে ডালশস্য ও তৈলবীজের ((ত্রে

গু(ত্বপূর্ণ অগ্রগতি সম্ভবপর হয়েছে।

বিভিন্ন গবেষণালব্ধ ফল এবং প্রযুক্তি(গত তথ্য গবেষণাগারে সীমাবদ্ধ না রেখে যাতে কৃষকের কাছে সহজেই পৌঁছে যায় তার দিকেও রাখা হয়েছে সজাগ দৃষ্টি। উন্নতজাত ব্যবহার, সঠিক পদ্ধতিতে চাষ ও শস্য পরিচর্যা প্রভৃতি উন্নত প্রযুক্তি(র সার্থক রূপায়ণের জন্য আছে ' ফ্রন্টলাইন ডিমন্‌স্ট্রেশন'। প্রযুক্তি(র সুপারিশ করার সময় সজাগ দৃষ্টি রাখা হয় যাতে সার, রোগ ও কীটনাশক ঔষধের অপরিমিত ব্যবহার ও অপচয়ের ফলে পরিবেশ দূষণ না হয় এবং কৃষকের প(ে লাভজনক হয়। নিয়মিত কৃষক সভা, প্রশি(ণ, কৃষিমেলা, বিভিন্ন তথ্য সমৃদ্ধ বুলেটিন প্রচার, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মী ও গবেষকের সমন্বিত প্রয়াস প্রভৃতির ফলশ্রুতি হিসাবে আজ পশ্চিমবঙ্গের কৃষকদের মধ্যে ডালশস্য ও তৈলবীজ চাষে বিশেষ আগ্রহ পরিল(িত হচ্ছে এবং এই দুটি ফসলের ফলনের হার উর্ধগামী করা সম্ভবপর হয়েছে।

সারণী- ৬.২৩

ডালশস্য ও তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্র উদ্ভূত ডালশস্য ও তৈলবীজ

ডালশস্যের উন্নত জাত

শস্য	জাত	বোনার সময়	ফলন (কুঃ/হেঃ)	মেয়াদ (দিন)	শতকরা	অন্যান্য উন্নত জাত
অড়হর	**শ্বেতা (বি-৭)**	**জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়**	**১৬-১৮**	**২২৫-২৪০**	**১৭.৬**	**ইউপি এ এস-১২০ প্রভাত, বিডিএন-২, আইসিপিএল-৮৭সি-১১**
চুনী		**ঐ**	**১৯-২০**	**২৪০-২৫০**	**১৮.০**	
	(বি-১৭৭)					
	রবি (২০/১০৫)	আশ্বিন	২০-২৫	১৫৫-১৬০	১৯.০	
মুগ	সোনালী (বি-১)	ফাল্গুন-চৈত্র ভাদ্র	৮-৯	৬০-৬৫	২৮.০	পন্থমুগ-২,পন্থমুগ-৪, পিডিএম-৫৪, সম্রাট, পুসা বৈশাখী
	পান্না (বি-১০৫)	ঐ	৮-১০	৫৫-৬০	২৭.০	
কলাই	কালিন্দী (বি-৭৬)	ঐ	৯-১১	৮০-৮৫	২৩.০	টি-৯,পন্থইউ-১৯, পন্থইউ-৩০
	সারদা (ডব্লিউবিইউ-১০৮)	ঐ	১২-১৩	৮০-৮৫	২৪.৬	
	গৌতম (ডব্লিউবিইউ-১০৫)	ভাদ্র	১২-১৩	৮০-৮৫	২৪.৬	
মুসুর	আশা (বি-৭৭)	কার্ত্তিক	১৪-১৬	১২৫-১৩০	২৭.০	কে-৭৫, পন্থএল-৪০৬ ৬৩৯, পুসা-৪,পুসা-৬
	রঞ্জন (বি-২৫৬)	ঐ	১৫-১৭	১২৫-১৩০	২৮.০	
	সুব্রত (ডব্লিউবিএল-৫৮)	ঐ	১৮-২০	১২০-১২৫	২৮.০	
ছোলা	মহামায়া-১ (বি-১০৮)	অগ্রহায়ণ	২২-২৪	১৩৫-১৪০	১৮.০	কে-৮৫০, পন্থজি-১১৪, রাধে, পুসা-২৪০,২৫৬ অবরোধী

শস্য	জাত	বোনার সময়	ফলন (কুঃ/হেঃ)	মেয়াদ (দিন)	শতকরা	অন্যান্য উন্নত জাত
	মহমায়া-২ (বি-১১৫)	ঐ		২২-২৪	১৩০-১৩৫	১৯.০
	অনুরাধা	ঐ	২৪-২৬	১৩০-১৩৫	১৯.০	
মটর	ধূসর (বি-২২)	কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ	১৫-১৭	১৩০-১৩৫	২৮.০	জি এস--,ডিডি--১৩ এইচ এফ পি-৪ রচ্না
খেসারী	নির্মল	অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি	১৫-১৮	১২০-১৩০	২৭.০	বাই ও এল-২১২,২০৮

তৈলবীজের উন্নত জাত

চৌরি	অগ্রণী (বি-৫৮)	আশ্বিন শেষ কার্ত্তিক প্রথম	৮-১০ (অসেচ)	৭০-৭৫	৪০	টি ডব্লিউ বি-৮৭২-২ ২৯৮৬,১৬৮৬
	পাঞ্চালী (টি ডব্লিউ সি-৩)	ঐ	১০-১২ (অসেচ) ১২-১৪(সেচসেবিত)	৭৫-৮০	৪২	
শ্বেত সরিষা	বিনয় (বি-৯)	কার্ত্তিকের প্রথমার্দ্ধ	১৪-১৬	৯৫-১০০	৪৬	ওয়াই এস বি-৮৭৮ ওয়াই এস সি বি-১১
	সুবিনয় (ওয়াই এস বি-৯-৭-সি)	ঐ	১৫-১৬	৯৫-১০০ ৪৬		
	ঝুমকা	ঐ	১৬-১৮	৯৫-১০০ ৪৬		
রাই	সীতা (বি-৮৫)	কার্ত্তিকের ১ম-২য় সপ্তাহের মধ্যে	১২-১৪	১০০-১০৫	৩৮	আর ডব্লিউ-৮৪১০, ৪৮১১,৮৪১৮
	ভাগীরথী (আর ডব্লিউ-৩৫১)	কার্ত্তিকের ১ম বার	১৪-১৬	১১০-১১৫	৩৮	
	সরমা (আর ডব্লিউ-৮৫-৫৯)	কার্ত্তিক থেকে অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি	১৫-১৭	১১০-১১৫	৩৮	
	সংযুক্ত(া (অসেচ)	ঐ	১০-১২	৯৫-১০০ ৩৮		
তিসি	নীলা (বি-৬৭)	কার্ত্তিক	৮-১০	১২০-১২৫	৪০	এল ডব্লিউ ৯২-৮৭০
	গরিমা	ঐ	১২-১৪	১২৫-১৩০	৪০	
কুসুম	বি এল ওয়াই-৬৫২	অগ্রহায়ণের প্রথমার্ধে	১০-১২	১২০-১৩০	৩৮	
তিল	তিলোত্তমা (বি-৬৭)	ফাল্গুন অথবা চৈত্র	৮-১২	৭০-৭৫	৪০	এস ডব্লিউ বি-২, বি টি ৮৯৪-১,বিটি ৮৯৩-১

শস্য	জাত	বোনার সময়	ফলন (কুঃ/হেঃ)	মেয়াদ (দিন)	শতকরা	অন্যান্য উন্নত জাত
	রমা	ঐ	১২-১৫	৮০-৮৫	৪৫	
বাদাম	এ কে ১২-১৪	ঐ	১৮-২০	১০০-১১০	৫০	
	ফুলে প্রগতি	ঐ	২০-২৫	১১৫-১২০	৫০	

সূত্র ঃ ডালশস্য ও তৈলবীজ গবেষণাকেন্দ্র, বহরমপুর

কৃষক বার্ধক্য ভাতা ঃ

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগ ১৯৮০ সালে এক সরকারী আদেশনামায় এই রাজ্যে প্রথম বার্ধক্যজনিত কারণে অসহায় কৃষকদের আর্থিক সাহায্যের জন্য মাসিক কৃষক বার্ধক্যভাতা প্রকল্প চালু করে। ৬০ বছরের অধিক বয়স্ক, দুস্থ এবং অসহায় কৃষকরা এই প্রকল্পের সুযোগ পেয়ে থাকেন। মাসিক ৬০ টাকা হারে বার্ধক্যভাতা ১৯৮০ সাল থেকে চালু হয় এবং এই হারে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত চলে। আবার ১৯৯৩ সাল থেকে মাসিক ভাতা বাড়িয়ে ১০০ টাকা (একশত) টাকা করা হয় এবং ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত চলে। তারপর আবার ১৯৯৭ সাল থেকে মাসিকভাতা বাড়িয়ে ৩০০ (তিনশত) টাকা করা হয় এবং এখন পর্যন্ত এই হারেই কৃষক বার্ধক্য ভাতা চলছে।

মহকুমা কৃষি আধিকারিকগণ কৃষক বার্ধক্য ভাতা মানি অর্ডার যোগে কৃষকের কাছে পাঠিয়ে দেন। তালিকাভুক্ত(কৃষক মারা গেলে কৃষকের স্ত্রী এই সুযোগ পেয়ে থাকেন, অন্যথায় আবার নতুন বয়স্ক কৃষককে এই প্রকল্পের আওতায় এনে জেলার মোট সংখ্যা ঠিক রাখা হয়।

প্রকাশ থাকে যে ১৯৯৮ সালে কৃষি বিভাগের এক সরকারী আদেশনামায় জেলার ১৪২৫ টি কৃষক বার্ধক্য ভাতা আবার পুনর্বিন্যস্ত করা হয়েছে যার ফলে মহকুমার বরাদ্দকৃত চিত্রটি এই রকম । প্রয়োজনের তুলনায় এই প্রকল্পের বরাদ্দ কম, ফলে বার্ধক্যজনিত কারণে, তাছাড়াও দুস্থ ও অসহায় কৃষকদের সবাইকে এই প্রকল্পের আওতায় আনা সম্ভব হচ্ছে না। তবুও নিঃসন্দেহে এই প্রকল্প দুস্থ ও অসহায় কৃষকদের বেঁচে থাকার রাস্তা মসৃণ এবং প্রশস্ত করেছে।

সেচ

মুর্শিদাবাদ রাজ্যের অন্যতম প্রধান কৃষি নির্ভর জেলা। অনিশ্চিত বৃষ্টিপাতের জন্য জেলার কৃষি প্রায়ই বিপুল (তির কবলে পড়ে। সেচের জন্য চাহিদাও তাই ব্যাপক। কৃষিবৈচিত্র ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য শর্ত হল সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ।

মুর্শিদাবাদ জেলার জল নির্গমন পথ, নদনদী বিল ও জলাভূমি সম্বন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা

সারণী - ৬.২৪

বার্ধক্য ভাতা ঃ মহকুমা ভিত্তিক চিত্র

	সাধারণ			তপসিলী জাতি ও উপজাতি			
মহকুমা	চাষী	বর্গাচাষী	কৃষিমজুর	চাষী	বর্গাচাষী	কৃষিমজুর	মোট সংখ্যা
বহরমপুর	১৮৬	৫৪	১৮৩	১৮	--	৩০	৪৭১
লালবাগ	১১৭	৩৩	১৫৬	১৫	--	২৭	৩৪৮
কান্দী	৮১	২৪	১২৩	২৪	--	৩৩	২৮৫
জঙ্গীপুর	৮৪	৩০	১৫০	২১	--	৩৬	৩২১
মোট সংখ্যা-	৪৬৮	১৪১	৬১২	৭৮	০০	১২৬	১৪২৫

সূত্র ঃ মুখ্য কৃষি আধিকারিক, মুর্শিদাবাদ

হয়েছে। তবে জেলার নদনদী ও ছোট ছোট জলধারাগুলি থেকে সেচের তেমন সুযোগ নেই বললেই চলে।

রাঢ় অঞ্চলে কৃত্রিম সেচ বা পুকুর, কুয়ো, দীঘি, কাঁদর থেকে হল সেচের ব্যবস্থা বহুল প্রচলিত। অন্যদিকে বাগড়ী অঞ্চলে কৃত্রিম সেচের ব্যবহার ছিল না বললেই চলে। বৃষ্টিপাতের বন্টন, ভূপ্রকৃতি, জলস্তর, মৃত্তিকা ইত্যাদি বিচার করে বলা যায় রাঢ়ের কৃষি পুরোপুরি কৃত্রিম সেচের উপর নির্ভরশীল। রাঢ় অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য পুকুর ও ডোবা। আর আছে জলাভূমি। ছোটনাগপুর মালভূমির সম্প্রসারিত অংশ হওয়ায় রাঢ় এলাকার মাটির নিচে আছে পাথরের স্তর। ফলে ভূগর্ভস্থ জল মাটির অনেক নিচে। টিউবওয়েল বসানো তাই ব্যয়সাধ্য। ফলে পুকুর-ডোবায় বর্ষার জল ধরে রেখে সেচের কাজে লাগানো হয়। এছাড়া ময়ূরা(ী সেচ প্রকল্পের জল পাওয়া যায় এ অঞ্চলে। কিন্তু রাঢ়ের মোট কৃষিভূমির সামান্য অংশই এই প্রকল্পের সেচ এলাকার অন্তর্ভুক্ত(। দ্বিতীয়তঃ খরার সময়, জল পাওয়া অনিশ্চিত। ফলে এ অঞ্চলে আমন চাষ বর্ষার বৃষ্টির ওপর নির্ভরশীল। আবার ভাগীরথী ও গঙ্গার মধ্যবর্তী, দুই নদীর পলিমাটি দিয়ে তৈরী বাগড়ী এলাকার ছবিটা একেবারেই আলাদা। পলি সঞ্চয় আর ভূমি(য়ের মধ্য দিয়ে গঙ্গা প্রতিবছর তার তীরভূমি ভাঙে গড়ে। বর্ষার খরস্রোত নদীতীরের নরম মাটিতে আঘাত করে বিপুল ভাঙন ঘটায়। প্রায়শই মাথা তোলে বড় বড় চর বা দ্বীপ। সেখানে চাষ হয়। মানববসতি গড়ে ওঠে। আবার হঠাৎ এক বর্ষায় সেই চর অদৃশ্য হয়ে যায়। প্রতি বর্ষায় প-াবিত হওয়ার ফলে মাটি অনেকটা জল ধরে রাখে ও চাষের উপযোগী হয়ে ওঠে। এখানে সেচ হয় মূলত বিল বা প্রাকৃতিক জলধারাগুলির জল মাঠের উপর দিয়ে বইয়ে নিয়ে। খাল বা কুয়োর অস্তিত্ব এ অঞ্চলে নেই।

সত্তর দশক থেকে বাগড়ী এলাকায় শু(হয়েছে টিউবওয়েল দিয়ে সেচের ব্যবস্থা। সে সময় থেকে ব্যক্তি(গত উদ্যোগে শ্যালো টিউবওয়েল বসিয়ে সেচের ব্যবস্থা করতে শু(করে সম্পন্ন চাষীরা। নব্বই দশকে শু(হয় আরও (মতাসম্পন্ন সাবমার্সিবল্ পাম্প-এর ব্যবহার। গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের সঙ্গে সঙ্গে এ ধরণের পাম্প-এর ব্যবহার দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে।কৃষির জলসেচের জন্য পুকুর, বিল, নদী অপে(া বর্তমান বাগড়ীতে কৃষি(ত্রের মধ্যস্থিত টিউবওয়েল-এর উপর নির্ভরশীল বেশী।

সুপ্রাচীন কাল থেকে মানুষ সেচের প্রয়োজনীয়তার কথা উপলব্ধি করেছে। হিন্দু রাজা, পাঠান বাদশাহ, মুর্শিদাবাদের নবাব এবং স্থানীয় রাজা ও জমিদার সকলেই সেচের জন্য পুকুর বা দীঘি খনন করার কাজকে গু(ত্ব দিয়েছেন, বিশেষতঃ রাঢ় অঞ্চলে। সাগরদীঘি, শেখের দীঘি, বা অন্য বড় দীঘি, খাল খনন করার পিছনে রাজনৈতিক বা ধর্মীয় যে কারণই থাক না কেন, সেচের প্রয়োজন পূরণের চিন্তাও নিশ্চয়ই ছিল। দীঘিগুলি আরও নানা রকম কাজে ব্যবহৃত হ'ত, বাদশাহী সড়কের পার্শ্ববর্তী দীঘিগুলি-র কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়। পুকুর-দীঘি থেকে জলসেচের প্রয়োজনীয়তা মানুষের মনে কত গভীরভাবে প্রোথিত তা উপলব্ধি করা যায় কুমারী মেয়েদের পুণ্যিপুকুর ব্রত পালনের অনুষ্ঠান থেকে।

বহু শতাব্দী প্রাচীন এই পুকুর দীঘিগুলির সেচ (মতা ত্র(মশ ত্র(মে আসছে। সংস্কার ব্যয়সাধ্য হওয়ায় ব্যক্তি(গত উদ্যোগে সংস্কারের কাজ প্রায় বন্ধ। মাঠের জল বয়ে পুকুরে ঢোকার পথগুলি মাটি পড়ে (দ্ধ, পুকুর দীঘির গর্ভ সংকুচিত হয়ে জলধারণ (মতাও কমে গেছে। বহু বড় বড় দীঘির পাড়ের জমিতে চাষ হচ্ছে এবং চাষের জমি বাড়তে বাড়তে দীঘির আয়তন দ্রুত কমছে।

এ জেলায় সেচের কাজে ব্যবহৃত দেশীয় সরল প্রযুক্তি(গুলির চমৎকার বর্ণনা পাওয়া যায় ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টারের 'এ স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাকাউন্ট অব্ বেঙ্গল' গ্রন্থের নবম খন্ড। জলের গর্ত গভীর হলে ঢেঁকলি নামে একধরণের যন্ত্র ব্যবহার হয়। একটি লম্বা বাঁশের অন্যপ্রান্তে ভারী পাথর বা মাটির তাল বেঁধে ভারী করা হয়। একজন মানুষ সহজেই এই ঢেঁকলি ওঠানামা করিয়ে সেচ দিতে পারেন। অল্প ডুবিয়েই যেখানে জল পাওয়া যায় সেখানে ব্যবহার হয় ডোঙা বা দোন বা দুনি। ডোঙা তৈরী করা হয় তালগাছের কাণ্ডকে ফাঁপা করে নিয়ে। ছোট নৌকার আকৃতির লোহার ডোঙা ত্র(মশ তালের ডোঙার স্থান দখল করে নেয়। ডোঙা বা দোনের এক মুখ চাপা। অন্য মুখ চওড়া। দুটি খুটির মাঝখানে একটি পিভটের ওপর চাপা দিকটা জলতলের সমান্তরালে রাখা হয়। চওড়া দিকটাকে জলে ডোবানো হয়। এই দিকটাকে আবার বাঁধা হয় লম্বা বাঁশের সঙ্গে। বাঁশের অন্যপ্রান্তে পাথর বা মাটির তাল লাগিয়ে ভারী করা হয়। জলের ওজন আর পাথরের ওজন সমান হওয়ায় জল তোলার পরিশ্রম কম হয়। তাই সরল যন্ত্রটি ব্যবহার করে সেচের কাজ করতে একজন মানুষই যথেষ্ট। আর এক ধরণের সেচের যন্ত্র হল সিউনি। সিউনি শর,খাগড়া, বাঁশের চিলতে বা ছিলা বুনে তৈরী করা হয়। অনেকটা আমাদের পরিচিতি কুলোর মত আকার, সিউনির চার কোনে চারটে দড়ি বাঁধা হয়। দুটি লোক জলের নালার দুপাশে দাঁড়ায়। দু'হাতে দুটি প্রান্তের দড়ি ধরে সিউনি দুলিয়ে দ্রুত জলসেচ করে।

ময়ূরাী সেচ

6th 5t

কৃষি ও সেচ

রাঢ় অঞ্চলের সেচ ব্যবস্থায় বিপুল পরিবর্তন এনেছে ময়ূরা(ী নদী-উপত্যকা পরিকল্পনা। বীরভূম, বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদের মোট ২৭টি ব্লকের ২,২৬,৭২০ হেক্টর জমি এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত(। তার মধ্যে মুর্শিদাবাদের ৯টি ব্লকের ৪৯,৭৯৭ হেক্টর জমি এই প্রকল্পের সেচ এলাকার অর্ন্তগত।

ময়ূরা(ী সহ ছোটনাগপুর মালভূমি থেকে নির্গত নদীগুলির গতিপথের আলোচনা দ্বিতীয় অধ্যায়ে করা হয়েছে। এই পাহাড়ী নদীগুলির মধ্যে কেবল অজয় বীরভূম জেলার পর বর্ধমানে প্রবেশ করে। অন্যসব ক'টি নদী বীরভূম জেলার উচ্চভূমি পার হয়ে মুর্শিদাবাদে নেমে আসে। মূলধারা ছাড়াও এই নদীগুলির মাঝে বয়ে চলে অসংখ্য প্রাকৃতিক শীর্ণ জলধারা, যাদের বীরভূমে বলে কাঁদর, মুর্শিদাবাদে তাদের পরিচিতি দাঁড়া নামে।

১৯২৭ সালে ব্যাপক শস্যহানি ময়ূরা(ী উপত্যকায় দুর্ভি(ে র মত পরিস্থিতি তৈরী করেছিল। ফলে ১৯২৮ সালে প্রথম ময়ূরা(ী নদীর ওপর মশানজোড়ে জলাধার নির্মাণের কথা ভাবা হয়। প্রাথমিক পরিকল্পনা যখন শেষ হয় (১৯৪১), তখন দ্বিতীয় বি(্বযুদ্ধ শু(হয়ে গেছে। বি(্বযুদ্ধের পর ১৯৪৬ সালে প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। ১৯৪৯ সালে বিহার সরকারের সাথে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চুক্তি(হয় এবং বিহারের (অধুনা ঝাড়খন্ড) সাঁওতাল পরগণা জেলার মশানজোড় বা ম্যাসানজোড়ে বাঁধ নির্মাণের অনুমতি পাওয়া যায়। জলাধার নির্মাণের পর প্রকল্পটি কার্যকর হয় ১৯৫৪-৫৫ সাল থেকেই। যদিও প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত(সবকটি বাঁধ ও জলবন্টনের পরিকাঠামো তৈরীর কাজ শেষ হয় ১৯৮৫ সালে।

মশানজোড় থেকে ৩২ কিলোমিটার ভাটিতে সিউড়ির উপকণ্ঠে তিলপাড়া ব্যারেজ। তিলপাড়া ব্যারেজ থেকে বামে ও দ(িণে প্রধান খালগুলি শু(হয়। বাম দিকের জলবন্টন ব্যবস্থাতে দুটি ছোট বাঁধ আছে—একটি দ্বারকা নদীর উপর দেউচাতে এবং অপরটি ব্রাহ্মণী নদীর উপরে বৈধরাতে। অন্যদিকে দ(িণের জলবন্টন ব্যবস্থাতেও আছে দুটি বাঁধ—একটি কাদিশালাতে বক্রে(্বের নদের উপর বক্রে(্বের বাঁধ, অন্যটি কোপাই নদীর উপরে কুলতোর বাঁধ।

উত্তর থেকে দ(িণে ব্রাহ্মণী নর্থ মেইন ক্যানাল, দ্বারকা-ব্রাহ্মণী ক্যানাল, ময়ূরা(ী দ্বারকা ব্রাঞ্চ ক্যানাল এবং কোপাই সাউথ মেইন ক্যানাল থেকে জলসেচের খাল মুর্শিদাবাদে প্রসারিত।

ব্রাহ্মণী নর্থ মেইন ক্যানাল, মাথকরণ গ্রামে এ জেলায় প্রবেশ করে এবং সেনদা, জামুর, উত্তর রামনা, উত্তর দেবগ্রাম জয়নগর, দ(িণ গ্রাম, ফুল শহরী এবং উদয়নগরের উপর দিয়ে বয়ে এসে গাঙ্গেড্ডায় শেষ হয়।

দ্বারকা-ব্রাহ্মণী ব্রাঞ্চ ক্যানাল খাসপুর গ্রামে মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রবেশ করে এবং ঝিল্লী ও খামারপুরের ওপর দিয়ে এসে সানিগ্রামে শেষ হয়।

ময়ূরা(ী দ্বারকা ব্রাঞ্চ ক্যানাল ঝিকড়হাটিতে জেলায় প্রবেশ করে এবং কালিকাপুর গ্রামে শেষ হয়। জেলার সামান্য অংশে এই ক্যানাল প্রসারিত।

কোপাই সাউথ মেইন ক্যানাল বর্ধমানের ওপর দিয়ে মালাগ্রামে জেলায় প্রবেশ করে এবং দত্তবা(টিয়া,শিমুলিয়া কুলুরি ও হামিদহাটি হয়ে কাগ্রামে এসে শেষ হয়।

মুর্শিদাবাদ জেলার ব্লক, প্রকল্পের সেচসেবিত মৌজার সংখ্যা ও নাম এবং সেচসেবিত এলাকার পরিমাণ সারণী- ৬.২৫ এ দেওয়া হ'ল। ১৯৭৪-৭৫ সাল থেকে অর্থাৎ ময়ূরা(ী কম্যাণ্ড এরিয়া ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট চালু হওয়ার পর থেকে শস্যভিত্তিক উৎপাদনের পরিমাণ দেওয়া হ'ল সারণী-৬.২৬ এ।

জেলায় সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণে যে দপ্তরগুলির ভূমিকা গু(ত্বপূর্ণ সেগুলি হল কৃষি সেচ বিভাগ, কৃষি প্রযুক্তি(বিভাগ এবং স্টেট ওয়াটার ইন্‌ভেস্টিগেশন ডাইরেক্টরেট।

কৃষি সেচ দপ্তরের দুটি বিভাগ মুর্শিদাবাদ জেলায় কাজ করে। একটি হ'ল কৃষি সেচ ১ নং ভুক্তি(, অপরটি কৃষি সেচ ২ নং ভুক্তি(। কৃষি সেচ ১ নং ভুক্তি(জেলার ৯টি ব্লকে কাজ করে। অবশিষ্ট ১৭টি ব্লক কৃষি-সেচ ২ নং ভুক্তি(র এলাকা।

মুর্শিদাবাদ জেলায় (ুদ্র সেচ (কৃষি কারিগরী) দপ্তরের দুটি বিভাগ আছে। এই বিভাগ নদী জলোত্তোলন প্রকল্পগুলির স্থাপন ও র(ণাবে(ণ করে। নদীতে পাম্প বসিয়ে জল তুলে পাইপ লাইন ও মাঠনালার সাহায্যে মাঠে মাঠে সেচের জল পৌঁছে দেওয়া হয়। ১৯৮৮-৮৯ সালে ওয়েস্ট বেঙ্গল মাইনর ইরিগেশন প্রজেক্ট -এ অল্প কয়েকটা নদীতে জলোত্তোলন প্রকল্প চালু হয়। ২০০৩-০৪ বছরের খসড়া জেলা পরিকল্পনা অনুযায়ী জেলাতে ৩৪৪টি বড় আকারের ও ১৭টি ছোট আকারের নদী জলোত্তোলন প্রকল্প চালু আছে। আর . আই. ডি. এফ -১, আর.আই.ডি.এফ.-২ এবং গ্র্যান্ট-ইন-এইড এই প্রকল্পগুলির রূপায়ণের জন্য স্বল্পকালে নদী জলোত্তোলন প্রকল্পের এতটা বিস্তার হয়েছে। সারণী -৬.২৭ এ যে বিভিন্ন উৎস থেকে (ুদ্র সেচ প্রকল্পের জলসেচ হয় তা দেওয়া হ'ল। সারণী-৬.২৮ তে দেওয়া হ'ল বিভিন্ন উৎসের মাধ্যমে সেচসেবিত এলাকার পরিমাণ। সারণী-৬ .২৯ এ দেওয়া হ'ল সেচের উৎস ও সেচসেবিত জমির ব্লক ভিত্তিক চিত্র ।

সারণী- ৬.২৭

ময়ূরাী প্রকল্প চালু হবার পর শস্যভিত্তিক উৎপাদন (টন/ হেক্টর)

আর্থিক বৎসর	ধান	গম	আখ	আলু	সরিষা	পাট	ডালশস্য
১৯৭৪-৭৫	১.৩৪০	২.২৭৩	৭১.৮০৩	১৫.৯৬৩	০.৪৩৫	২.০২৬	০.৭৬৪
১৯৭৫-৭৬	১.৪৫৪	১.১৬০	৭০.৪২১	৯.৮৯৬	০.৪৩৬	২.০৫০	০.৭৬৪
১৯৭৬-৭৭	১.৪৪৬	২.০৩০	৭৫.১৭৪	১৪.৯৮২	০.৪৩৬	২.১০০	০.৭৭৯
১৯৭৭-৭৮	২.২২০	২.১৭৮	৭১.৯৭৩	১৩.৬০৩	০.৫৩৪	২.১০০	০.৭০২
১৯৭৮-৭৯	১. ৭৩৬	১.৯৭০	৭১.০৪০	১৩.৬৮৩	০.৪৮৮	২.০০০	০.৫৮৫
১৯৭৯-৮০	১.৬০৬	১.৯৭৪	৭৭.০৮৩	১৩.৬৭০	০.৬৭৯	২.১১০	০.৭৪৪
১৯৮০-৮১	২.০৯৪	১.৩৯০	৭০.৭০৩	১০.৬৭০	০.৭৬৪	১.৭৬৪	০.৭০৬
১৯৮১-৮২	২.২৩২	২.০৯৯	৭০.৬৯২	১১.৬৭৩	০.৬৫০	২.১৬৫	১.০৫৯
১৯৮২-৮৩	১.৪৪০	২.২৪৩	৮৮.১৪০	১৬.১৯০	০.৭৩৬	২.১০০	০.৫৮৩
১৯৮৩-৮৪	২.০৩২	২.৬২৪	৪৪.১৪০	১৬.১৯০	০.৮১২	২.০৫০	০.৬৬০
১৯৮৪-৮৫	১.৯৫০	২.৫২৩	৭৩.৫৬৭	১৭.৫২৫	০.৮০০	২.১৫০	০.৬৮৯
১৯৮৫-৮৬	১.৫৯০	২.৫২৯	৭১.৪৩৫	১৬.২৭৬	০.৭৮৮	২.১৭৮	০.৭২২
১৯৮৬-৮৭	৩.৫৩৬	২.২৬৭	৭১.৬২০	১৩.৭৬১	০.৬৭৪	৯.৫১	০.৪৪০
১৯৮৭-৮৮	৩.৭১০	২.০৬৩	৬৫.০৩৩	১৩.৭৬১	০.৬২৯	৮.৪৫২	০.৫৮৭
১৯৮৮-৮৯	২.৯১০	২.৫৩৬	৬৫.২৭৭	১৫.১০০	০.৭২০	৮.৭৫২	০.৭০৬
১৯৮৯-৯০	৩.২৫৩	১.৩৭৯	৬৫.৭২৭	১৭.২০০	০.৪৯৭	৮.৫২	০.৩৭৬
১৯৯০-৯১	৩.৩৫২	২.০৯৬	৬১.০৫৬	১৬.৭৫০	০.৭০০	৮.৪৩	০.৬২৯
১৯৯১-৯২	২.৬৭০	২.২৭৬	৬১.৯১৭	১৭.৭৭৮	০.৬১০	৭.৬১৯	০.৭৫০
১৯৯২-৯৩	৩.৬২৮	২.৩৬০	৬৪.৭৫৫	১৬.৮৬৬	০.৬১০	৭.৬১৯	০.৫৮৪
১৯৯৩-৯৪	২.৩৮৪	১.৮৬৯	৭১.০০০	১৭.৩৩৩	০.৭৪২	-	০.৪৮৯
১৯৯৪-৯৫	২.৩৬৭	২.৩৮৬	৭২.৮৮৭	১৯.৪৭২	০.৮২১	-	০.৬৪৪
১৯৯৫-৯৬	২.২১৩	৩.৪৭২	৫৭.১৭৭	২১.২০৯	০.৭৪৯	-	০.৫৭২
১৯৯৬-৯৭	২.১১৫	২.৫৯১	-	২২.৯০০	০.৯৫৯	-	০.৬৫০
১৯৯৭-৯৮	২.৩৪৮	২.০৪৫	৬২.৭১০	২৩.০৩৫	০.৮২৭	-	০.৫১৩
১৯৯৮-৯৯	২.৬৭৫	১.৯৯১	৫৯.৯৮৬	২০.৩৪১	০.৯১৯	-	০.৫৫৮
১৯৯৯-২০০০	২.৮৮৪	২.০৬২	৪৬.৭১৩	২২.৭১০	০.৮০৬	৮.৬	০.৭৪৬

সূত্র ঃ অ্যানুয়াল রিপোর্ট, ১৯৯৯-২০০০, ময়ূরাী কম্যান্ড এরিয়া ডেভেলপমেন্ট অথরিটি

সারণী- ৬.২৮

সেচের বিভিন্ন উৎস (হাজার হেক্টরে)

বৎসর	সরকারী খাল	পুকুর	কুয়ো	অন্যান্য	মোট
১৯৯৩-৯৪	৪৯.৬০	২৫.২৮	—	১২৭.৬৬	২০২.৫৪
১৯৯৪-৯৫	৪৫.৪৩	১০.৭৫	—	১৯২.৪০	২৪৮.৫৮
১৯৯৫-৯৬	৪৯.১৬	১০.৭৫	—	৫৫.৫০	১১৫.৪১
১৯৯৬-৯৭	৪৪.০৮	১০.৭৯	—	৫৫.২৯	১১০.১৬
১৯৯৭-৯৮	৫১.১৯	১০.৮১	—	৫৪.৯৫	১১৬.৯৫
১৯৯৮-৯৯	৫১.০১	১০.৮২	—	৭৭.৬৪	১৩৯.৪৭
১৯৯৯-০০	৫০.৮১	১০.৮৩	—	৭৫.৮৪	১৩৭.৪৮
২০০০-০১	৫০.২০	১০.৮৩	—	১৬৬.৮২	২২৭.৮৫

সূত্র ঃ ডিস্ট্রিক্ট স্ট্যাটিসক্যাল হ্যান্ড বুক

সারণী-৬.২৯

সরকারী প্রকল্প থেকে সেচ (হাজার হেক্টরে)

বৎসর	গভীর নলকূপ	নদী জলোত্তোলন	অগভীর নলকূপ
১৯৯৩-৯৪	৪৮১	৩৬৪	৯০৯
১৯৯৪-৯৫	৫৬২	৪১৬	৯০৯
১৯৯৫-৯৬	৫৬২	৪১৬	৯০৯
১৯৯৬-৯৭	৫৬২	৪১৬	৯২৩
১৯৯৭-৯৮	৪৮৭	৩৭৩	৯২৩
১৯৯৮-৯৯	৫১৮	২৯৯	—
১৯৯৯-০০	৪৮৯	৩১৬	৫১৬
২০০০-০১	৫১০	৩০০	৪৯১

সূত্র ঃ ডিস্ট্রিক্ট স্ট্যাটিসক্যাল হ্যান্ড বুক

সারণী— ৬.৩০

ব্লক ভিত্তিক সেচের উৎস ও সেচ সেবিত জমি (হেক্টর)

ব্লক	খাল	পুকুর		নদী জলোত্তোলন		গভীর নলকূপ		অগভীর নলকূপ		অন্যান্য		মোট	
	এলাকা(হেঃ)	সংখ্যা	এলাকা	সংখ্যা	এলাকা	সংখ্যা	এলাকা	সংখ্যা	এলাকা	সংখ্যা	এলাকা	সংখ্যা	এলাকা
ফরাক্কা	--	৫০	৩০	--	--	--	--	--	--	১৬২	২৮০	২১২	৩১০
সামশেরগঞ্জ	--	১০০	১০০	--	--	৪	১০৩	--	--	৫০০	১০০০	৬০৪	১২০৩
সুতি-১	--	--	--	১১	২৪৯	২	৩৫	--	--	১০০০	২০০০	১০১৩	২২৮৪
সুতি-২	--	৫	২০	২	১৭	৪	১২০	--	--	১৩১০	১৫০০	১৩২১	১৬৫৭
রঘুনাথগঞ্জ১	১৭১৪	১২০	১৩৫	৭	১৯১	৪	১২০	--	--	৮৯৫	১৫২৫	১০২৬	৩৬৮৫
রঘুনাথগঞ্জ২	--	১০০	৪০	৮	২৮১	--	--	৬	১২	৬৪৯	৭০০	৭৬৩	১০৩৩
সাগরদীঘি	১৪৩৯০	৭৯৩	১৭৩৭	৮	২৯৭	২১	৬১১	--	--	২৪১৭	৪০০০	৩২৩৯	২১০৩৫
লালগোলা	৬৬	১৮৮০	৩৮৮	১২	২৭৬	৩৯	১১৪২	১৬	৩২	২৪০০	৪৮০০	৪৩৪৭	৬৭০৪
ভগবানগোলা১	--	--	৫	৯২	১৭	৪৯৬	৭	১৪	৪০০০	৮০০০	৪০২৯	৮৬০২	
ভগবানগোলা২	--	--	৫	২৪	১৪	৩৯৩	--	--	৪৬৫০	৯৩০০	৪৬৬৯	৯৭১৭	
মুর্শি-জিয়াগঞ্জ	১৯২	২২	১০৪	২৭	৯৭৩	৩৩	৯৯০	৬৫	১৩০	২০১০	৪০২০	২১৫৭	৬৪০৯
নবগ্রাম	--	১৪৭৯	৮৭৭	--	--	৪৩	১২৯৮	--	--	৩০০০	৬০০০	৪৫২২	৮১৭৫
খড়গ্রাম	১২০৯৩	১৮০০	১৮০০	৮	১৩২	১	৩০	--	--	২৯৮৫	৬৬৫৫	৪৭৯৪	২০৭১০
বড়এ(া	১৮০০	১০৯	২২৫৪	১	১৫	৮	২১০	--	--	২২০০	৪৫৩৫	২৩১৮	৮৮১৪
কান্দী	--	৪৭৮	৩৬৬	১৩	৪১৪	১৬	৪৮০	--	--	২৪০০	৪৮০০	২৯০৭	৬০৬০
ভরতপুর-১	৫৮৬৪	--	--	১০	৩১১	৫	১৫০	--	--	৪৭০	১০০০	৪৮৫	৭৩২৫
ভরতপুর-২	৭৯৩৩	৬৭০	১২০০	১৪	৩১৪	১৩	৩৯০	--	--	১২২৫	৪০০০	২৯২২	১৩৮৩৭
বেলডাঙ্গা-১	--	৮০০	৭৯০	১৫	৫৮২	৪	১৬০	১৮	৯০	৩৮৪৬	৬৭৩০	৪৬৮৩	৮৩৫২
বেলডাঙ্গা-২	--	৬৬	৬৬	১৫	৪৯৯	৬	২৪০	৬	৩০	৩৪৬০	৬০৫৫	৩৫৫৩	৬৮৯০
নওদা	--	--	--	৩০	১১৭৮	২৭	১০৮০	৪৬	২৩০	৩৬২৩	৬৩৪০	৩৭২৬	৮৮২৮
হরিহরপাড়া	--	৩০	২৬	৩০	৯৬৭	৩২	১২৫৫	৫২	২৬০	৫৯৫০	১০৪১৩	৬০৯৪	১২৯২১
বহরমপুর	--	--	--	৩৫	১৩৫৭	৫২	২০৩০	৯০	৪৫০	৬২৪০	১০৯২০	৬৪১৭	১৪৭৫৭
রাণীনগর-১	--	--	--	৯	২০৬	২৩	৯২০	৬১	৩০৫	৩০৫০	৩১০০	৩১৪৩	৪৫৩১
রাণীনগর-২	--	--	--	--	--	২৮	১১২০	৯	৪৫	৫৬০০	১১২০০	৫৬৩৭	১২৩৬৫
ডোমকল	--	--	--	২২	৯৭৯	৬৪	২৫৬০	৪৩	২১৫	৫১৯০	৯০৮২	৫৩১৯	১২৮৩৬
জলঙ্গী	--	--	--	১৩	৩৪২	৫০	২০০০	৭২	৩৬০	৩৭৩২	৬৫৩১	৩৮৬৭	৯২৩৩

সূত্র ঃ ডিস্ট্রিক্ট স্ট্যাটিসক্যাল হ্যান্ড বুক

কৃষি ভিত্তিকএই জেলায় সেচের বহুল প্রসারে কৃষির ল(ণীয় উন্নতি সাধিত হয়েছে। উন্নত প্রযুক্তি(, উচ্চ ফলনশীল বীজ, উন্নত কীটনাশক, রাসায়নিক সার প্রভৃতির ব্যবহারে কৃষিজ পণ্যের গড় উৎপাদনশীলতা অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্য দিকে চাষীদের মধ্যেও এসেছে পরিবেশ সচেতনতা। রাসায়নিক সার প্রয়োগের আগে অনেক চাষী এখন মাটি পরী(া করিয়ে নিচ্ছেন। কীটনাশক প্রয়োগের আগে পরামর্শ নিচ্ছেন কৃষি প্রযুক্তি(বিদের। চিনছেন বন্ধু পোকা শত্রু পোকা। ফলে পরিবেশের (তি অনেকটাই কমিয়ে আনা গেছে। তবে এখনও শস্য পর্যায় সম্পর্কে চাষীদের তেমন সচেতন করা যায়নি। জমির স্বাস্থ্য র(ায় শিম্ব গোত্রীয় ফসলের চাষ যে জ(রী এটা চাষীদের বোঝা দরকার। বোরো চাষ কমিয়ে এদিকে নজর দেওয়া দরকার চাষীদের। তাতে একদিকে যেমন লাভ পরিবেশের তেমনি দীর্ঘমেয়াদে লাভ চাষীরই। জেলার কৃষি(ত্রে এটাই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

তথ্যসূত্র ঃ

ভূমি সদ্ব্যবহার ঃ ঐতিহাসিক পটভূমি

১। অ্যান একাউন্ট অব্ ল্যান্ড ম্যানেজনেন্ট ইন দি ডিস্ট্রিক্ট অব্ মুর্শিদাবাদ, ১৮৭১-১৯৫০

২। বি.বি.মুখার্জী, ফাইনাল রিপোর্ট অন দি সার্ভে অ্যান্ড সেট্লমেন্ট অপারেশন ইন দি ডিস্ট্রিক্ট অব্ মুর্শিদাবাদ, ১৯২৪-১৯৩২

৩। ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার, এ স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাকাউন্ট অব্ বেঙ্গল, নবম খন্ড, লণ্ডন, ১৮৭৬, প্রথম ভারতীয় সংস্করণ, দিল্লী, ১৯৭৪

৪। ডিস্ট্রিক্ট সেন্সাস হ্যান্ড বুকস, মুর্শিদাবাদ, সেন্সাস ১৯৫১

৫। ডিস্ট্রিক্ট সেন্সাস হ্যান্ড বুকস, মুর্শিদাবাদ, সেন্সাস ১৯৬১

৬। ডিস্ট্রিক্ট সেন্সাস হ্যান্ড বুকস, মুর্শিদাবাদ, সেন্সাস ১৯৭১

৭। ওয়েষ্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারস, মুর্শিদাবাদ, ১৯৭৯

জেলার কৃষিজীবন ঃ

১। পুলকেন্দু সিংহ, লোকায়ত মুর্শিদাবাদ, বহরমপুর

২। শক্তি(নাথ ঝা, বাগড়ির কৃষি উৎপাদনঃ শ্রেণী বিন্যাসের (পান্তর এবং সমস্যা, বার্ষিক মুর্শিদাবাদ বি(ণ, ১৯৯২, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

মাটি ঃ

১। এ রিপোর্ট অন দি সয়েল ওয়ার্ক ইন ওয়েষ্ট বেঙ্গল, প্রথম খন্ড, জেলা মুর্শিদাবাদ

২। ডিরেক্টর অব্ এগ্রিকালচার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সেচ ঃ

১। অ্যানুয়াল রিপোর্ট ১৯৯৯-২০০০, ময়ূরা(ী কমান্ড এরিয়া ডেভেলপমেন্ট অথরিটি, ওয়েষ্ট বেঙ্গল।

২। ডিস্ট্রিক্ট স্ট্যাটিসক্যাল হ্যান্ড বুক, মুর্শিদাবাদ, ২০০১,ব্যুরো অব্ অ্যাপ্লায়েড ইকোনমিক্স অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিকস্, পশ্চিমবঙ্গ সরকার